দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। ২৫ মাঘ – ১৪২১। website : www.eswastika.com।

জন্মসার্ধশতবর্ষে
মনীষী
পঞ্চানন বর্মা

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২৫ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
৯ ফেব্রুয়ারি - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,
Website : www.eswastika.com

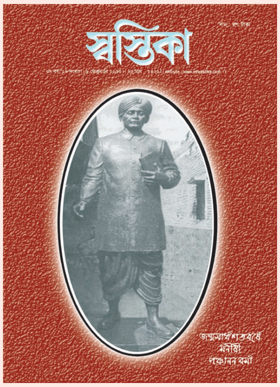

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮
খোলা চিঠি : চাচা আপনা দল বাঁচা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯
মানুষকে বোকা বানাতে কেজরিওয়াল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি নেই ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০
পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু বলা যায় না ▯ মোহিত রায় ▯ ১১
ক্রান্তদর্শী পঞ্চানন ▯ সাধন পাল ▯ ১৩
মনীষী পঞ্চানন বর্মার দৈনন্দিন জীবনচর্যা ▯ ডঃ দীপক কুমার রায় ▯ ১৬
ইতিহাস অনুসন্ধানী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ▯ দেবব্রত চাকী ▯ ১৯
শ্রীকৃষ্ণাবতার : সমাজ পুরুষের অস্ত্রোপচার ▯ ড: ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ২১
প্রথম মহিলা রাজ্যপাল সরোজিনী নাইডু ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩
ইসলামিক আতঙ্কের মূল ▯ মুজফফর হোসেন ▯ ২৭
ওবামার ভারত সফর ও আমাদের প্রাপ্তি ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ২৯
স্বাগত নীতি-আয়োগ : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ অনেকটাই মিটবে ▯ দেবাংশু ঘোড়ই ▯ ৩২
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতীয় গণতন্ত্র ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীলঙ্কায় পালাবদলে তামিলদের কতটা লাভ?

শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। এর ফলে কি সেখানকার তামিলদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে? নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মৈত্রীপামা সিরিসেনা কি শ্রীলঙ্কায় দুই গোষ্ঠীর সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করে তামিলদের ন্যায় প্রদান করতে সমর্থ হবেন? এই নিয়েই এবারের বিশেষ বিষয় : শ্রীলঙ্কায় পালাবদল ও তামিলদের লাভ।

লিখেছেন— **মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অব:), অর্ণব নাগ প্রমুখ।**

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

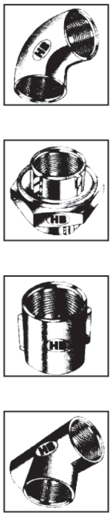

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বীরভূমে শুদ্ধিকরণ

রামপুরহাটের খরমাডাঙা গ্রামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া বিতর্ক শুরু হইয়াছে। বলা হইতেছে শুদ্ধিকরণের নামে শতাধিক জনজাতিকে নাকি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, এই দেশের জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তো হিন্দুই, তাহাদের আবার হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়োজন কোথায়? তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ডেরেক ওব্রায়েন অভিযোগ করিয়াছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জোর করিয়া ধর্মান্তরকরণ করিতেছে। সত্য কি তাহাই? ঘটনা হইল, আজ দুই বছর ধরিয়া বীরভূম জেলার কয়েক হাজার জনজাতি পুরুষ মহিলা ধর্ম পরিবর্তন করিয়া খৃস্টান হইয়াছিলেন। কেন তাঁহারা খৃস্টান হইয়াছিলেন এলাকার নুরি পাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বাণী মুর্মুরা বলিয়াছেন। বাণী মুর্মুর বলিয়াছেন, আমাদের টাকাপয়সার প্রলোভন দেখাইয়া খৃস্টান করা হইয়াছিল। খরমাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা সনৎ টুডুও বলিয়াছেন, লোভে পড়িয়া খৃস্টান হইয়াছিলাম। হরিরামপুর গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গল কিস্কুরও একই অভিযোগ। আজ দুই বছর ধরিয়া রাজ্যের একটি জেলার জনজাতিদের প্রলোভন দেখাইয়া খৃস্টান মিশনারীরা দীক্ষিত করিল এবং প্রশাসন নিশ্চুপ রহিল। অথচ আজ যখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ধর্মান্তরিত জনজাতিরা ধর্মান্তরিত হইবার জন্য অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব ধর্মে আস্থা প্রকাশ করিল তখন তাহা লইয়া বিতর্ক শুরু হইল। আর মুখ্যমন্ত্রী আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিতেছেন। অথচ দুই বৎসর ধরিয়া জনজাতিদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার প্রক্রিয়া চলিলেও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন কেন? কাহারা টাকা দিয়া ধর্মান্তরিত করিয়াছিল আজ প্রতারিত ব্যক্তিরা তাহা বলিয়া দিয়াছেন। নুরি পাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বাণী মুর্মুরের মতো সকলেই বলিয়াছেন—'আমাদের টাকাপয়সার প্রলোভন দেখাইয়া খৃস্টান করা হইয়াছিল, কিন্তু এইসব সুবিধা তো দূরঅস্ত আমরা উল্টে অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। ভয় বা প্রলোভন দেখাইয়া এই দেশের মানুষকে খৃস্টান বা মুসলমান করা হইয়াছে, ইহা আজ সর্ববিদিত। এখন সেই হিন্দুরাই যখন নিজেদের ধর্মে ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছেন তখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গেল গেল রব তোলা হইতেছে।

৩৪ বৎসরের বাম সরকার তাহাদের আমলে উন্নয়নের নানা গল্প শুনাইলেও বীরভূমের বহু গ্রাম এখনও উন্নয়নের ছোঁয়াচ হইতে বঞ্চিত। গ্রামে বিদ্যুৎ নাই, ডাক্তার নাই। হাসপাতাল বলিতে রামপুরহাট অথচ যানবাহনের ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থায় সুযোগ লইয়াছে চার্চ এবং খৃস্টান মিশনারীরা। খৃস্টান মিশনারীদের সাহায্য করিতেছে তৃণমূল-কংগ্রেস। ডেরেক ওব্রায়েন আজ বড় বড় কথা বলিতেছেন অথচ জনজাতিদের খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিবার সময় তাঁহার ভূমিকা কি ছিল তাহা তদন্ত হইবার প্রয়োজন। উল্লেখ্য, সারদার টাকা যেমন মুসলমান জঙ্গিদের হাতে গিয়াছে তৃণমূলের সৌজন্যে, তেমনই সারদার টাকা চার্চের তথা খৃস্টান মিশনারীদের হাতেও গিয়াছে। না হইলে বীরভূমের মতো একটি গ্রামে চার্চের প্রয়োজনই-বা কি এবং তাহারা জনজাতিদের ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টাই-বা করিতেছে কেন? উল্লেখ্য, সারাদেশেই খৃস্টান মিশনারীরা সেবা উন্নয়নের নামে জনজাতিদের ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ ঝাড়খণ্ড ওড়িশায় এই প্রবণতা চলিতেছে বছরের পর বছর। মিশনারীদের এই উদ্যোগে মাওবাদীরাও সাহায্য করিয়া থাকে। ওড়িশার মিশনারীদের এই উদ্যোগের বিরোধিতা করিবার ফলে মিশনারীদের হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশোনা করিলে খৃস্টান হইতে হয়। অথচ রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরিচালিত বিদ্যালয়ের হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশোনা করিলে কাহাকেও হিন্দু হইতে হয় না। ইহার পরও বলা হইতেছে বিজেপি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নাকি ধর্মান্তরকরণের উদ্যোগ লইয়া রাজ্যে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ঘটনা হইল, সিপিএম এবং তৃণমূলের উদ্যোগেই ধর্মান্তরকরণ চলিতেছে। সংখ্যালঘু ভোটের লালসায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, দুই ২৪-পরগনাতে বহু মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করা হইয়াছিল, এখন আবার বীরভূমের মতো জেলার গ্রামেও খৃস্টান করিবার প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়াতে বহু ব্যক্তিকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা ইতিমধ্যেই হইয়াছে। ধর্মান্তর প্রতিরোধে তাই ধর্মান্তর-বিরোধী আইন করিতে হইবে।

সুভাষিত

মুর্খস্য পরিহর্তব্যঃ প্রত্যক্ষ দ্বিপদঃ পশুঃ।
ভিনত্তি বাক্যশূলেন অদৃশ্যং কন্টকো যথা।। (চাণক্যনীতি)

মূর্খকে দ্বিপদ পশুর মতো ত্যাগ করা উচিত। মূর্খ কেবল বাক্যবাণে বিঁধতে পারে, ঠিক যেমন কাঁটা অদৃশ্যভাবে বিদ্ধ করে।

উস্থি বাজারে হিন্দুদের দোকান লুঠ ও অগ্নিসংযোগ

দোকান ভেঙে লুঠ করেছে দুষ্কৃতীরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানোর পর এবার মুসলমানদের নজরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার উস্থি। অনৈতিকভাবে রিক্সা ভাড়া চাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত। জানা যায়, গত ২৮ ডিসেম্বর এক হিন্দু পরিবার রিক্সা করে উস্থিতে এসে পৌঁছায়। রিক্সা চালক ভাড়া বাবদ ১০০ টাকা দাবি করে বসে। ভাড়া বেশি চাওয়ার প্রতিবাদ করলে স্থানীয় মুসলমান যুবকরা ওই পরিবারের ওপর আক্রমণ চালায়। উপস্থিত স্থানীয় হিন্দু যুবকরা বেশি ভাড়া নেবার প্রতিবাদ করে। ঘটনা সেদিনের মতো মিটে গেলেও ক্ষান্ত থাকেনি তৃণমূল আশ্রিত ওই মুসলমান দুষ্কৃতীরা। পরদিন ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় বিধায়ক তথা সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা। ড্যামেজ কন্ট্রোলের পরিবর্তে তিনি অশান্তি আরো বাড়িয়ে তোলেন। শোনা যায়, মন্ত্রীর নেতৃত্বে এলাকার কয়েকশো মুসলমান দুষ্কৃতী সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ স্থানীয় বাজারে বেছে বেছে হিন্দু দোকানগুলিতে যথেচ্ছ পরিমাণে লুঠপাট চালায়। এলাকার বাসিন্দারা আরো জানান, গিয়াসুদ্দিনের নির্দেশ অনুসারে আশপাশের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলির প্রধান এবং নেতা কর্মীরা গাড়িতে করে লোক পাঠাতে শুরু করে। হিন্দুদের মোট ৬০টি দোকান লুঠ করা হয়। কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি তারা লুঠ করে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। ২৩টি দোকানে লুঠ করা সম্ভব না হওয়ায় সেগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে এলাকায় উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও ঘটনাস্থলে তাদের দেখা যায়নি। উল্টে তারা ৬ জন নিরপরাধ হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করে। উস্থির পাশে কুলেশ্বর গ্রামেও বোমা, গুলিসহ আক্রমণ চালায় মুসলমান দুষ্কৃতীরা। ঘটনার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় জেলা যুব মোর্চার সম্পাদক প্রতাপ হাজরার নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ, থানা ঘেরাও চলতে থাকে। সেই সঙ্গে নিরপরাধ যুবকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি এবং দোষীদের শাস্তির আবেদন জানানো হয়। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, পুলিশ শাসক দলের চোখরাঙানির ভয়েই দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

দিল্লীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডকে হস্তান্তরের তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি দিল্লী উচ্চ আদালতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়ের করা এক আবেদনের ভিত্তিতে রাজধানীর নানান প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ১২৩টি সম্পত্তি ইউপিএ আমলে হস্তান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার তদন্ত শুরু করেছে। সংবাদে প্রকাশ উল্লেখিত হস্তান্তরগুলির মূলে রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, এমনটাই অভিযোগ। সম্প্রতি এই মর্মে নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন— ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার প্রায় শেষ মুহূর্তে পূর্বতন মন্ত্রী সলমন খুরশিদ ওই সম্পত্তিগুলির হস্তান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তাঁর উদ্যোগ যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এ ব্যাপারে নাইডু তাঁর বক্তব্যে কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় করেননি। সংবাদসূত্রে উঠে আসা বিস্ফোরক তথ্য অনুযায়ী দিল্লীর নানান অভিজাত এলাকায় অবস্থিত ওই ১২৩টি সম্পত্তি প্রায় ১০০ বছর আগে ১৯১১-১৫ সালে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার অধিগ্রহণ করেছিল। সূত্র অনুযায়ী ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসেই ইউপিএ সরকার ওই ১২৩টি সম্পত্তির অধিগ্রহণ খারিজ করে দিল্লী ওয়াকফ বোর্ডের নামে মালিকানা হস্তান্তর সংক্রান্ত (Denotifying the earlier acquisition) একটি খসড়া ক্যাবিনেট নোট প্রস্তুত করেছিল। আশ্চর্যজনক দ্রুততায় গত বছর মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনের আচরণবিধি লাগু হওয়ার ঠিক আগের রাতে মন্ত্রিসভা ওই গোপন নোটে অনুমোদন দেয়। নগর উন্নয়ন দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিকের বয়ান অনুযায়ী দিল্লী হাইকোর্টে দাখিল করা আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁরা এই হস্তান্তর এত দ্রুততায় হওয়ার যৌক্তিকতা, এর আইনি বৈধতা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে আইন বিভাগের পরামর্শ চেয়েছেন। আলোচ্য সম্পত্তির সিংহভাগই হচ্ছে দিল্লীর কনট প্লেস, মথুরা রোড, লোধি রোড, মান সিং রোড, পান্ডারা রোড, অশোক রোড, জনপথ, করলবাগ, সদর বাজার, দরিয়াগঞ্জ বা পার্লামেন্ট হাউস প্রভৃতি মহাগুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল জে.ই. বাহনাবতী সরকারকে তাঁর মতামত জানিয়ে বলেন, সম্পত্তিগুলির আইনত হস্তান্তর কোনো মতেই সম্ভব নয়। এর পরেই সংশ্লিষ্ট দপ্তর কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। ওই কমিটি পরবর্তীকালে যখন হস্তান্তরের পক্ষে মত দেয় তখন সরকারি অ্যাটর্নি জেনারেল তাদের অনুমোদনের পক্ষে সায় দিতে বাধ্য হন বলে প্রকাশ।

নির্মল গঙ্গা প্রকল্প নয়া উদ্যোগ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গঙ্গা দূষণমুক্ত করার উচ্চ-আকাঙ্ক্ষিত প্রকল্পে নিজেরই বেঁধে দেওয়া চূড়ান্ত সময়সীমা (২০১৮)-র বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্দেশ্য যান (স্পেশাল পারপাস ভেহিকল) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল মোদী সরকার। গত ২৮ জানুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে জানান হয় যে গঙ্গার উপকূলবর্তী ১১৮টি শহর ও নগরে স্পেশাল পারপাস ভেহিকল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নালা-নর্দমা আবর্জনা মুক্তকারী গাছ (সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট)-ও বসানো হবে। শুধুমাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই নয়, পরিবেশ রক্ষা আইন (এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশান অ্যাক্ট)-র বিভিন্ন দিকও খতিয়ে দেখছে সরকার, যাতে নদীতে শিল্প-আবর্জনা যথেচ্ছভাবে ফেলা ঠেকানো যায়। সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝাড়খণ্ড দিয়ে প্রসারিত গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অন্য চারটি রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার কিংবা উত্তরাখণ্ডে ঝাড়খণ্ডের থেকে প্রসারিত গঙ্গা দৈর্ঘ্যে বেশি হলেও কর্মপ্রক্রিয়া চালাতে এই রাজ্যে সুবিধা হবে বুঝে এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। তাই ঝাড়খণ্ডকে আপাতত 'মডেল' করে সারা দেশে গঙ্গাদূষণ রোধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার।

নির্মল গঙ্গা নামে এই প্রকল্পে ২০৩৭ কোটি টাকা ধার্য করেছে সরকার। এছাড়া গ্রামীণ শৌচালয়ের জন্য দরকার আরও ৫০০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সূত্রে খবর গঙ্গার পার্শ্ববর্তী ১৬৪৯টি গ্রামে পঞ্চায়েত চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে গঙ্গাদূষণ রোধে যাবতীয় কার্যকর ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে। বিহারে নির্মল গঙ্গা প্রকল্পের হাল বেশ খারাপ বলে সরকারি সূত্রে প্রকাশ। সে তুলনায় উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভালো। নালা-নর্দমা আবর্জনা মুক্তকারী গাছের এই মুহূর্তে প্রয়োজন ৩৮৪৭ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন। কিন্তু এখন তা পাওয়া যাচ্ছে ৮৭৯ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন। ২০৩০ সালে এর আনুমানিক চাহিদা গিয়ে দাঁড়াবে ৪৭৭৩ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন। বর্তমানে এর সহজলভ্যতার এই হার চলতে থাকলে ওই বছরে সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে মাত্র ১২৬৩ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন। চাওয়া আর পাওয়ার এই দুস্তর ব্যবধান ঘোচাতে তাই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ নিতে চাইছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার।

নির্মল গঙ্গা প্রকল্পের প্রথম পর্বে ৫৬টি শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই শহরগুলির পাশ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গাদূষণ রোধ করতে পারলে প্রাথমিক পর্যায়ের ৮০ শতাংশ কাজ মিটে যাবে বলে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় সেখানে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু, জলসম্পদ ও নদী-উন্নয়ন এবং গঙ্গা-সংস্কার মন্ত্রী উমা ভারতী, পানীয় জল ও শৌচালয় মন্ত্রী বীরেন্দর সিং, পরিবেশ-মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর এবং পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মহেশ শর্মা আর এই মন্ত্রকগুলির সচিবরা এতে উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে এ ব্যাপারে বেঙ্কাইয়া শীঘ্রই আলোচনায় বসতে চান বলে মন্ত্রক সূত্রে খবর।

নির্মল গঙ্গা-প্রকল্প

* গঙ্গার পার্শ্ববর্তী ১৬৪৯টি গ্রাম-পঞ্চায়েতকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
* ঝাড়খন্ডের এই উন্নয়ন পরিকল্পনা 'মডেল' হিসেবে পরিগণিত হবে।
* গ্রামীণ শৌচালয়ের জন্য প্রয়োজন ৫০০০ কোটি টাকা।

সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট*

বর্তমানে	২০৩০ সালে
চাহিদা ৩৮৪৭	চাহিদা** ৪৭৭৩
জোগান ৮৭৯	জোগান ১২৬৩

** প্রতিদিন মিলিয়ন লিটারের হিসাবে।*

*** আনুমানিক।*

এক মিলিয়ন আমাদের দেশের হিসেবে দশ লক্ষ।

কলকাতা জে বি রায় আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শতবর্ষ

সংবাদদাতা॥ আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ভারতের সর্বপ্রাচীন ও পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সরকারি আয়ুর্বেদ কলেজ জে বি রায় আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল শতবর্ষে পদার্পণ করছে। এই কলেজের শতবর্ষপূর্তিতে ভারতের প্রতিষ্ঠানিক আয়ুর্বেদ শিক্ষারও শতবর্ষ পূর্ণ হবে। আশা করা যায়, শতবর্ষের আলোকে এই কলেজ আয়ুর্বেদ চর্চাকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

সংশোধনী

স্বস্তিকা-র ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায় 'দিল্লী দখলে কিরণ বেদীই সেরা বাজি' প্রতিবেদনটিতে (১৭ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় কলমে) লেখা হয়েছে— 'তাঁদের চার সন্তান রয়েছে।' পড়তে হবে— তাঁদের এক সন্তান রয়েছে।' অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

—স্বঃ সঃ

৯ মাসে সার্ভিস ট্যাক্সের আদায় ১০ শতাংশ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নরেন্দ্র মোদী সরকারের পক্ষে একটি নিশ্চিত সুখবর ক্ষমতায় আসার ৯ মাসের মধ্যে দেশের সার্ভিস ট্যাক্স আদায়ে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদসূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। বৃহত্তর ব্যবসায়িক পরিপ্রেক্ষিতে এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসার এটি একটি সূচক।

বিগত ৯ মাসের এনডিএ সরকারে চাকরি ক্ষেত্রে ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া কারিগরী প্রযুক্তি সরবরাহ ও কনসালটেন্সি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নজরে এসেছে। এর মধ্যে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রেও কর আদায়ে উন্নতি ঘটেছে। গত এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরে শেষ হওয়া ৯ মাসে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সমস্ত রকম পরিষেবা ক্ষেত্র মিলিয়ে কর আদায় ১.২০ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১.১০ লক্ষ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্যভাবে এই বৃদ্ধির মধ্যে কারবারি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান ও জন নিযুক্তি (Recruitment Agencies) সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে কর আদায়ে বৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ২৪ ও ২৩ শতাংশ। সার্ভিস ট্যাক্স বিভাগের আধিকারিকদের তথ্য অনুযায়ী কর আদায়ে এই বৃদ্ধির বাইরে প্রত্যক্ষ কর্ম সংস্থানের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। আজকাল বহুজাতিক বহু সংস্থাই নিয়োগ সংক্রান্ত সংস্থাগুলির বাইরে সরাসরি বহু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পথে যাচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে তারা ইচ্ছে মতো এদের চাকরি থেকে সরিয়েও দিতে পারে।

দেশে লাগু থাকা তুলনামূলকভাবে কড়া শ্রম আইনের বাইরে থাকার সুযোগ নিতেই বর্তমানে বিশেষজ্ঞ পরিষেবা (Specialised Service) প্রদানের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাধান্য পাচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ কোনো একটি শ্রম-নিযুক্ত সংস্থা (Man power Recruitment Agency) এক কথায় ৫০০ থেকে ৭০০ লোক চটজলদি যেমন এক লপ্তে তাদের গ্রাহককে চাহিদা অনুযায়ী দিতে পারে তেমনি একটি মাত্র নোটিস দিয়ে তাদের প্রত্যাহারও করে নিতে পারে। এমনটাই অভিমত করসংক্রান্ত আধিকারিকদের। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলক্ষেত্রে পরিষেবা কর আদায় বিগত ৯ মাসের তুলনায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞমহলের মতে এর দুটো কার হতে পারে। এক মানুষের হাতে নগদের যোগান বেড়েছে বা দেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পরিষেবা কর আদায় ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে বিমাক্ষেত্রে আদায় আলোচ্য সময়ে ৩৪৮১ কোটি টাকা থেকে কমে ৩০৭২ কোটি টাকা হয়েছে। সাধারণ বিমাক্ষেত্রেও (General Insurance) ক্ষেত্রে নগণ্য ৩ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। বিগত ডিসেম্বর ২০১৩ সালের ৬১৯২ কোটি থেকে ৬৩৭৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। তবে পরিষেবা ক্ষেত্রের অংশীদার নিরাপত্তা ও তদন্তমূলক (Security & Detective) সংস্থাগুলির ১৭৭০ কোটি টাকা থেকে ২০৭৬ কোটি টাকা আদায়ের ফলে শতকরা ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি বড়সড় যোগদান করেছে। দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানগুলি অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তাবহনকারী বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

স্কুল প্রাঙ্গণে দেবী সরস্বতীর মুণ্ডচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরস্বতী পূজার ঠিক একদিন আগে দেবী সরস্বতী মূর্তি টুকরো টুকরো অবস্থায় ভেঙে পড়ে থাকতে দেখলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বালিয়াড়া কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, স্কুল ময়দানে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ২৫ জানুয়ারি সকালে দেখা যায়, দেবী মূর্তির ভগ্নদশা। ২৪ জানুয়ারি রাতে দেবীমূর্তি-সহ বাহন হাঁসেরও মুণ্ডচ্ছেদ করে দুষ্কৃতীরা। ফলে স্কুলচত্বরে এক উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তবে কে বা কারা এই নক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই এক শ্রেণীর মুসলমান দুষ্কৃতী এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। কিছুদিন আগেই হাওড়ার সালকিয়াতেও সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। ওই ঘটনায় একজনের প্রাণহানিও ঘটে। বালিয়াড়া স্কুল কর্তৃপক্ষ ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। উত্তপ্ত পরিবেশ সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে কারা এই ঘটনায় জড়িত এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় তদন্ত চলছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত যা খবর এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

চাচা আপনা দল বাঁচা

মাননীয় মুকুল রায়
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
তৃণমূল কংগ্রেস

মুকুল দাদা, আপনাকে চিঠি লিখতে গিয়ে ঠিকানা নিয়ে বিস্তর ঝামেলায় পড়েছি। বুঝতে পারছি না কোথায় পাঠাব! দিল্লী না কলকাতা? তৃণমূল ভবন না নিজাম প্যালেস? আসলে আপনি কোথায় আছেন সেটাই যে ঠিক করে বুঝতে পারছি না। এমনকী আপনার পরিচয় লিখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লেখা ঠিক হলো কিনা সেটা নিয়েও তো চিন্তা। আপনি ফুলে না মূলে, দিদিতে না নিজেতে, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না। আপনার সঙ্গীদের নিয়েও তো গোটা রাজ্য জুড়ে জল্পনার গোলমাল।

আপনি কিন্তু এটা মোটেও ভালো করছেন না। দিদিকে এত টেনশনে রাখা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আমার মতো আমার দিদিও ঠিক বুঝতে পারছেন না আপনি কার --- দিদির না সিবিআইয়ের। বইমেলায় গিয়ে যে একটু অটোগ্রাফ বিলোবেন, ঘরে বসে কটা ছবিতে রং বোলাবেন সেটাও করতে পারছেন না। সারাদিন কী যেন একটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে পরের বইমেলার জন্য বই লিখতে হবে জেলে বসে। কালীঘাটে দিদির বাড়িটা এমনিতেই একটা বদখত জায়গায়। বাড়ির পাশেই খাল। আর খাল টপকালেই আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ মেললেই জেলের বিশাল উঁচু পাঁচিল চোখে পড়ে। আবার রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঘরের আলো নিভিয়ে দিতেই জেলের উজ্জ্বল আলো জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সারাদিন মাথার মধ্যে জেল ভাবনা, আবার চোখের সামনেও জেল। কী মুশকিল বলুন তো? দিনের বেলা তো মাটির দিকে তাকিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ছেন যাতে জেলের পাঁচিল দেখতে না হয়। আর রাতে অসুবিধা হলেও ঘরের আলো নেভাচ্ছেন না। তাতেও কি নিস্তার আছে? সারাদিন মাথার মধ্যে ঘুরছে জেল। চোখ বুজলেও একের পর গারদ। কুণাল, টুম্পাই, মদন, রজতের সঙ্গে মিটিংয়ের স্বপ্ন। পাশে খোঁচা খোঁচা দাড়ির সুদীপ্ত। স্বপ্নে জেলটাই কখনও কখনও ডেলোর বাংলো হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে সেই বাংলো হয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ি। অথচ জেল। বাড়ির সবাই মিলে জেলেই হচ্ছে কালীপুজো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে বাস্তবে ফিরতে সময় লাগছে। কিন্তু অনেক সময় নিয়েও ভয়ের ঘোর কাটছে না।

শুধু কি দিদি, গোটা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারটাই তো একই রকম দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বাড়িতে ভালো ভালো রান্না হলেও তার স্বাদটা যেন জেলের মোটা-পোড়া রুটির মতো।

মুকুল দা, ভালো হচ্ছে না। প্লিজ এই রকম করবেন না। যা হোক একটা কিছু বলে দিন। বেশি দিন এইভাবে দিন এবং রাত কাটানো দিদির কাছে জেল যন্ত্রণার থেকেও মারাত্মক হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দিদি আপনাকে বকেছিলেন জানি। সব সময়ই মুকুল মুকুল করে চাকর বাকরের মতো ব্যবহার করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। দলটা আপনিই পুরো সামলেছেন। সাংসদ, বিধায়ক, পুরপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সদস্য কেনা বেচা সব আপনার হাত দিয়ে হয়েছে অথচ কথায় কথায় গালমন্দ শুনতে হয়েছে। তবু দিদি কিন্তু আপনাকে নিজের ভাইয়ের থেকে বেশি ভালোবেসেছেন। দীনেশ ত্রিবেদী যখন রেল বাজেট নিয়ে দুষ্টুমি করলেন তখন আর কাউকে নয়, আপনাকেই রেলমন্ত্রী বানিয়েছেন। আপনিও যোগ্য সেনাপতির মতো 'দিদি বাজেট' পেশ করেছেন। কিন্তু এবারের বকাটা আপনি মেনে নিতে পারলেন না কেন?

সেদিন দিল্লী থেকে ফিরে আপনি নবান্নে গিয়েছিলেন। তখন দিদি বলেছেন যে সারদা নিয়ে যা করেছো নিজে করেছো এখন নিজে সামলাও। আমি বা দল কিছু করতে পারব না। ব্যাস আপনি পুরো বিষয়টাকে সিরিয়াস নিয়ে দিল্লী গিয়ে বদলে গেলেন। কদিন আগেও আপনি সিবিআইকে গালাগাল না দিয়ে জলস্পর্শ করতেন না আর এখন সিবিআইয়ের প্রশস্তি ছাড়া কথাই বলছেন না। দিদির তো টেনশন হবেই। দিদি বকেছে বলে কেউ দিদির নাম বলে দেয়? দিদির আত্মীয়দের দুষ্টুমি ফাঁস করে দেয়? সত্যি মুকুলদা এটা আপনি ভালো করছেন না। দিদি বড্ড টেনশনে।

—সুন্দর মৌলিক

মানুষকে বোকা বানাতে কেজরিওয়াল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি নেই

গূঢ় পুরুষের কলম

এই কলমের প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন দিল্লীর বিধানসভার ৭০টি আসনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। হয়তো ভোটের ফলাফলও সবাই জেনে গেছেন। কিন্তু এই প্রতিবেদন যখন লিখছি তখনও জনমত সমীক্ষায় বিজেপিই এগিয়ে আছে। শুধু প্রশ্ন উঠছে যে বিজেপি-তে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এটা নিতান্তই গুজব। এই রটনার এক শতাংশ সত্য হলে বিধানসভার ৭০টি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের ভোট কাটতে বিক্ষুব্ধরা গোঁজপ্রার্থী দাঁড় করাতো। তা হয়নি। প্রসঙ্গত, একটা কথা বলে নেওয়া ভাল যে বিজেপিতে সদ্য যোগ দিয়েই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় এবং রাজ্যবর্ধন রাঠোর। সুতরাং কিরণ বেদী একমাত্র নন। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রথমে স্থির করেছিলেন যে দিল্লী বিধানসভার নির্বাচনের আগে কোনো প্রার্থীকেই মুখ্যমন্ত্রী প্রোজেক্ট করা হবে না। নির্বাচনের পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে নির্বাচিত বিধায়করাই তাঁদের নেতা নির্বাচন করবেন। কিন্তু জনমত-সমীক্ষায় দেখা যায় যে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার ঘোষণা না করায় আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী পদে সমর্থন করছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এ যে সোনার পাথর বাটি। যা সোনারও নয়, পাথরেরও নয়। বাধ্য হয়েই বিজেপি-কে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার ঘোষণা করতে হয়েছে। আশঙ্কা ছিল পরিস্থিতি যে দিকে মোড় নিচ্ছিল তাতে দিল্লীতে আবার ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হতে চলেছিল। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এবিপি নিউজের জনমত সমীক্ষায় বিজেপি ৪৫-৪৬টি আসন পেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা না করায় দ্বিতীয় সপ্তাহের জনমত সমীক্ষায় আসন কমে দাঁড়ায় ৩৪টি-তে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে বিজেপি-র প্রয়োজন ৩৬টি আসনে জয়। সম্ভবত এই কারণেই বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, 'নির্বাচনী কৌশলের জন্যই দল কিরণ বেদীকে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার ঘোষণা করেছে।'

আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল চতুর রাজনৈতিক নেতা। মুখে যে কথা বলেন কাজে তার ঠিক উল্টোটি করেন। অনেকটা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই। মমতা মুখ্যমন্ত্রীত্বের এক বছর শেষে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দাবি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির ৯৯ শতাংশই তিনি করে দিয়েছেন। ক্ষমতায় আসার চার বছর পরেও বাস্তব হচ্ছে প্রতিশ্রুতির ১০ শতাংশ কাজও হয়নি। শুধু দুর্নীতির পাঁকে তাঁর দল ও সরকার আকণ্ঠ ডুবে আছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০১৩ সালের দিল্লী বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন, 'চরম দুর্নীতিবাজ কংগ্রেসের হাত তিনি ধরবেন না'। বাস্তবে পরে কী হয়েছিল সকলেরই জানা। অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রীর কুরশি দখলের জন্য কংগ্রেসের হাত ধরেছিলেন। হ্যাঁ, চরম দুর্নীতিবাজ কংগ্রেসের সমর্থনে দিল্লীতে আম আদমি পার্টির সরকার হয়েছিল। সৌভাগ্য যে সেই সরকার মাত্র ৪৯ দিন ক্ষমতায় ছিল। অসত্য কথা বলে মানুষকে সাময়িকভাবে বোকা বানাতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি নেই। কেজরিওয়াল দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েই ঘোষণা করেছিলেন দিল্লীতে কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির শেষ দেখে ছাড়বেন। বাস্তবে এই ব্যাপারে তিনি কিছুই করেননি। কারণ এই কেলেঙ্কারির কাদা ঘাঁটলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অসুবিধা হোত। এখানেই শেষ নয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দিল্লীর বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থায় কর্মরত সব অস্থায়ী কর্মীদের তিনি স্থায়ী করে দেবেন। করেননি। করার চেষ্টাও করেননি। দিল্লীর উপকণ্ঠের সমস্ত বেআইনি বস্তিগুলিকে তিনি ক্ষমতায় এলে আইনি করে দেবেন। বাস্তবে ক্ষমতায় এসে কেজরিওয়াল সাহেব আম আদমিকে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর জীবনযাত্রাই পাল্টে যায়। দামি গাড়ি চড়া থেকে তাঁর চার্টার্ড বিমানে দলের তহবিলের অর্থ সংগ্রহের জন্য দুবাই পাড়ি দেওয়া সবই ৪৯ দিনের মধ্যেই তিনি করেছিলেন। অনেকটা আমাদের রাজ্যের মমতার মতোই। ঘটা করে বিশ্ব শিল্প সম্মেলন করছেন। বড় বড় শিল্পপতিরা এই রাজ্যে নাকি লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন। কিন্তু আসলে সবই ফক্কা। কেজরিওয়াল বলেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলে কয়েক লক্ষ সিসিটিভি দিয়ে দিল্লীর প্রতিটি রাজপথ মুড়ে দেবেন, যাতে নারী লাঞ্ছনাকারীদের চিহ্নিত করা যায়। এ সবই ফাঁকা বুলি। যে ৪৯ দিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন তখন একটিও সাধারণ মানুষের কল্যাণে পদক্ষেপ নেননি। বরং আম আদমি থেকে তাঁর দূরত্ব বাড়িয়েছিলেন।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় আমি জানি না দিল্লীর আম আদমি কেজরিওয়ালের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়েছেন কিনা। যদি হয়ে থাকেন তবে বাংলার মানুষ এখন যে যন্ত্রণা ভোগ করছেন সেটাই দিল্লীবাসীর ভাগ্যে ঘটবে। ▯

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু বলা যায় না

মোহিত রায়

সংখ্যালঘু বললেই পশ্চিমবঙ্গের সবাই ভাববেন মুসলমানদের কথা। কারণ মোট জনসংখ্যায় মুসলমানদের সংখ্যা এখনো অর্ধেকের কম, ৩০ শতাংশের মতন। পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ ও খৃস্টানদের সংখ্যা আরো অনেক কম, তবু তাঁদের কথা সাধারণত মনে আসে না। অথবা ওড়িয়া বা মাড়োয়ারিদের সংখ্যাও কনেক কম, তাঁরাও ভাষাগত সংখ্যালঘু। কিন্তু সংখ্যালঘু বললে তাঁদের কথা মনেই আসে না। যখন স্কুলে মুসলমান মেয়েরাই সাইকেল পায় তখন সবাই বলেন সংখ্যালঘু বলে তারা এই বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কথা কারো মনেই আসে না। অবশ্য কেউ বলতে পারেন মুসলমানরাই প্রধান সংখ্যালঘু, তাই তাদের কথাই বলা হয়। কিন্তু এর পর যদি কেউ বলেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা আদৌ সংখ্যালঘু নয় তাহলে নিশ্চয় পাঠক ভাববেন যে সে ইস্কুলে অঙ্কে প্রথম শ্রেণী থেকেই ফেল করছে। অথচ ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যালঘু বলাটা আর আদৌ ঠিক নয়।

সংখ্যায় কম হলেই কোনো গোষ্ঠীকে আমরা কিন্তু সংখ্যালঘু বলি না। সমাজে চোর, ডাকাত বা ব্রাহ্মণরাও সংখ্যায় কম কিন্তু তা বলে তাদের তো সংখ্যালঘু বলা হয় না। পাড়ার মাস্তানকে আমরা পাড়ার সংখ্যালঘু বলি না। আসলে সংখ্যালঘু বলতে আমরা বুঝি মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশ কম বলে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত একটি শ্রেণী। অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গরা, ইরাকে শিয়া সমাজে সুন্নি মুসলমানরা বা ভারতের একটা বড় অংশে কয়েকশো বছর ধরে হিন্দু দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়েও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তখন তাঁদের আমরা আলাদা করে সংখ্যালঘুর মর্যাদা দিই না। কোনো একটি গোষ্ঠী সংখ্যায় কম হলেই তাঁদের জন্য বিশেষ সরকারি বা সামাজিক সুবিধার ব্যবস্থা করি না। তাহলে কাদের আমরা সংখ্যালঘু বিশেষ সুবিধা দেব?

কারা সংখ্যালঘু আর কোন সংখ্যালঘুরা বিশেষ সুবিধা পেতে পারে? আমাদের সংবিধান ও আইনি ভাষ্য সংখ্যালঘু ব্যাপারে কি বলে? কিন্তু সংখ্যালঘু কারা, সংখ্যালঘুর কোন সংজ্ঞা বা সংখ্যালঘু হবার সংখ্যাটি কত তা নিয়ে কোনো কথা ভারতীয় সংবিধানে নেই। ভারতীয় সংবিধানের ২৯ ও ৩০নং ধারায় সংখ্যালঘু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। ২৯নং ধারার শিরোনাম— সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা, যাতে বলা হয়েছে যে কোনো নাগরিকদের নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে ও ধর্ম, জাত, ভাষা-র কারণে কাউকে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ৩০নং ধারাটির শিরোনাম সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার সম্পর্কিত। সংখ্যালঘুদের আর কোনো বিশেষ অধিকারের কথা সংবিধানে নেই। ২০০২ সালের টি এম পাই বনাম কর্ণাটক সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ১১ জন বিচারপতির বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো একটি জনগোষ্ঠী ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু কিনা তা নির্ধারিত হবে সমগ্র দেশের নয় একটি রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ মুসলমানরা সংখ্যালঘু কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে তাঁরাই সংখ্যাগুরু। কিন্তু একটি রাজ্যে কোন সংখ্যালঘুরা বিশেষ সুবিধা পেতে পারে তা নিয়ে ভারতীয় সংবিধান বা এমনকী রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার রক্ষার প্রকাশনাতেও কিছু নেই।

সাধারণত জনসমাজে সেই অংশকেই সংখ্যালঘুর বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় যারা সংখ্যায় কম হওয়ার ফলে সমাজ বা রাষ্ট্র দ্বারা দীর্ঘদিন নিপীড়িত, সে নিপীড়ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা ভাষাগত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ এই মর্যাদাটি প্রথম থেকেই পেয়ে আসছে। কিন্তু কেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা বিশেষ সুবিধা পাবেন? পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই কিন্তু তার জন্য কতটা রাষ্ট্র দায়ী আর কতটা মুসলমান সমাজের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী? ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকার সার্বিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্য দূরীকরণে একেবারে ব্যর্থ, তার প্রভাব দরিদ্র মুসলমান সমাজ-সহ সব দরিদ্রকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে মুসলমান সমাজ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বলার

> “‘সংখ্যালঘু’দের দাপটে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যাতে আরবি ভাষা ও ইসলামি বিষয় পড়া বাধ্যতামূলক। এই ‘সংখ্যালঘু’দের হাতে কামদুনি-কাটোয়ায় ধর্ষিতা হচ্ছে হিন্দু মেয়েরা। খাগরাগড় কাণ্ডের পর জানা গেছে যে ‘সংখ্যালঘু’ অধ্যুষিত অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে জেহাদি অস্ত্র কারখানা।”

অপেক্ষা রাখে না। ঠিক একই অবস্থা ঘটেছে দরিদ্র বনবাসী ও অন্যান্য হিন্দু গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রেও। সুতরাং গরিবদের জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা দিতে হলে ধর্মনির্বিশেষে সবাইকেই দিতে হবে, মুসলমান বলে নয়। অনেকে দরিদ্র মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু সমাজের তফসিলি সম্প্রদায়ের ও বনবাসীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে তাদের বিশেষ সুবিধার যুক্তি দিয়ে থাকেন। ভারতীয় সমাজে হাজার বছর ধরে চলে আসা জাতপাতের প্রভাবে অবহেলিত হিন্দু জনগোষ্ঠীগুলির বিশেষ সুবিধার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই কথা মুসলমানদের ব্যাপারে খাটে না। মনে রাখতে হবে, এই সংখ্যালঘু মুসলমানরাই ভারতে ও বাংলায় কয়েকশ বছর রাজত্ব করেছেন, ফলে এদেশে চিরকাল সংখ্যালঘুর দুরবস্থা তাঁদের কখনোই ছিল না। এর পর দু'শ বছরের বৃটিশ রাজত্বেও মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শাসনে ছিলেন না। বরং যুক্ত বাংলায় স্বাধীনতার পূর্বে মুসলিম লীগই ছিল প্রধান শাসক দল। সেজন্যই একদা-শাসক সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুসমাজের চিরকাল নিপীড়িত তফসিলি সমাজের পশ্চাৎপদতার তুলনা করা চলে না। ফলে ধর্মের সঙ্গে সাইকেল যোগের মতনই পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের এই চিরস্থায়ী সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু হওয়াটাও বেশ আশ্চর্যজনক।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

স্বাধীনতার পরেই বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। হিন্দু শিক্ষিত জনসংখ্যা দেশত্যাগে বাধ্য হওয়ার ফলে শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে চাকরিবাকরি ও অন্যান্য পেশায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল প্রচুর। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ পড়ে রইল ইমাম-মোল্লাদের হেফাজতে। ভোটের জন্য এদের তোয়াজ করে চলল বামপন্থী সরকার। কিন্তু স্বাধীনতা- পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলমান জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা ভাষাগত ক্ষেত্রে কোনো সরকারি বিশেষ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের উপর কোনো নিপীড়ন বা বঞ্চনা করা হয়নি। দীর্ঘকালীন অবিশ্বাসের জন্য বাড়িভাড়া থেকে বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানদের যে অনেক অসুবিধায় ভুগতে হয় তা অনস্বীকার্য। কিন্তু মুসলমান সমাজের উপর শারীরিক অত্যাচার, নারীর উপর অত্যাচার, সম্পত্তির লুণ্ঠন বা বিতাড়ন— এধরনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে বিরল, কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা। এর জন্য দেশভাগের প্রাথমিক ধাক্কার পর নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা চলে এসেছে ও আসছে। ইসলামে কোনো ভেদাভেদ নেই— এই গপ্পোটি ছুঁড়ে ফেলে মুসলমানদের বিভিন্ন জাতেরাও সংরক্ষণের দাবি তুলে এখন ওবিসি (অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী) কোটায় বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজের ৯০ শতাংশকেই এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে এরা সুবিধা পাচ্ছে দুদিকের— একদিকে এরা হিন্দু সমাজের জাতের বৈষম্যের সুবিধা নিচ্ছে আবার 'সংখ্যালঘু' হবার সুবিধাগুলি পেয়েও সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফলে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দাপটে দিনে দিনে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে। এই দাপটে তারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে তাদের ধর্মীয় দাপট দেখাতে শুরু করেছে। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুসলমান জনসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধি। লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু আসার পরও স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে ১৯ শতাংশ মুসলমান জনগোষ্ঠী কীভাবে ৩০ শতাংশে পরিণত হলো তা এক সংখ্যাতাত্ত্বিক বিস্ময়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চাবিকাঠি এই সমাজের ইমামরা অনেকটাই হাতে নিয়েছে। ভোটের জন্য বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মৌলবাদী শক্তির হাতে ক্রমশ পুতুলে পরিণত হচ্ছেন। এই 'সংখ্যালঘু'দের দাপটে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন; এই 'সংখ্যালঘু'দের দাপটে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যাতে আরবি ভাষা ও ইসলামি বিষয় পড়া বাধ্যতামূলক। এই 'সংখ্যালঘু'দের হাতে কামদুনি-কাটোয়ায় ধর্ষিতা হচ্ছে হিন্দু মেয়েরা। খাগরাগড় কাণ্ডের পর জানা গেছে যে 'সংখ্যালঘু' অধ্যুষিত অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে জেহাদি অস্ত্র কারখানা।

'সংখ্যালঘু সেল' বন্ধ হোক

একটি সমাজের এরকম 'শক্তিশালী' ৩০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোনোভাবেই সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়া যায় না। *পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজকে বলতে হবে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী।* পশ্চিমবঙ্গের সব রাজনৈতিক দলের একটি 'সংখ্যালঘু সেল' আছে যার অর্থ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দলে একটি সেল। ভোটের জন্য এই সেলটি জোরদার করবার প্রতিযোগিতা চলে সব দলের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গে এই 'সংখ্যালঘু' রাজনীতির খেলা শেষ করতে হলে সব দলের এই 'সংখ্যালঘু সেল'গুলিকে অবিলম্বে বন্ধ করে সব সদস্যকে একই জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। যেহেতু রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি, ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই 'সংখ্যালঘু' মানসিকতা থেকে বেরোতে পারলে সমাজের অন্যান্য অংশেও তার দ্রুত প্রভাব পড়বে। নইলে ভীত সন্ত্রস্ত সংখ্যাগুরু সমাজ শক্তিশালী *'সংখ্যালঘু'র* তোষণেই ব্যস্ত থাকবে। তখন পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই আগামী দিনে থাকবে কিনা সন্দেহ। ■

ক্রান্তদর্শী পঞ্চানন

সাধন কুমার পাল

মনীষী পঞ্চাননের তিনটি উক্তি উল্লেখ করে লেখাটা শুরু করা যাক। ‘‘রাজবংশী পরিচয় ত্যাগ করিলে হামেরা হারেয়া যামো’’। ‘‘হিন্দু-মুসলমান বিচার নাই রে, মানুষজন নোঞাঁয় ভিন। উলসি ধারা আর্তের উদ্ধার,— এইত ক্ষত্রিয়ের চিন’’। ‘‘তোর আশা সগাঁয় করুক, তুই কারো আশা না করিস’’। আমার মনে হয় এই তিনটি উক্তির মধ্যেই উত্তরবঙ্গের প্রবাদপুরুষ মনীষী পঞ্চাননের জীবন সাধনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপায় নিহিত রয়েছে। এই তিনটি উক্তির অনেক বিশ্লেষণ থাকতে পারে। তবে একটি বিশ্লেষণ এটাও যে মনীষী পঞ্চানন চেয়েছিলেন জন্মগত দিক থেকে রাজবংশী পরিচয়ে গর্ব অনুভব করুক এই সমাজের প্রতিটি মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত ভারতের সেবার জন্য আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে ক্ষাত্রতেজের স্ফুরণ ঘটানোই হোক এই সমাজের জীবন সাধনা। তুলনা ছাড়া সঠিক মূল্যায়ন হয় না। মনীষী পঞ্চাননের কাজের মূল্যায়নের জন্যই আরো দু'টি জনগোষ্ঠীর কথা সংক্ষেপে বলে লেখার মূল অংশে আসা যাক।

তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলায় আত্মপরিচয়হীন বেশ কিছু জনগোষ্ঠী বসবাস করে। ইতিহাস বলছে মহীশূর দখল করার পর টিপু সুলতানের অত্যাচারে ওই এলাকা থেকে অনেকেই নীলগিরি পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই এলাকার একটি জনগোষ্ঠী টোডা, যারা কিনা নিজেদের পাণ্ডবদের বংশধর বলে দাবি করে। নিরামিষ-ভোজী ও খুবই উচ্চবংশীয় হওয়ার দাবিদার টোডারা পঞ্চপাণ্ডবদের অনুকরণে পরিবারের সমস্ত ভাই মিলে একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে। প্রথম সন্তান বড় ভাইয়ের। পরের সন্তানেরা ক্রম অনুসারে অন্যান্য ভাইদের বলে গণ্য হয়। একটি তথ্য বলছে বৃটিশ সরকার এদের কাছ থেকে টোডাদের এলাকা কিনে নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের বনে জঙ্গলে বাস করতে বাধ্য করেছিল। স্বাধীন ভারতে টোডারা আর দশটা পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মতো তপসিলী উপজাতিভুক্ত গোষ্ঠী হিসেবে বিশেষ সরকারি সুযোগ সুবিধার ভাগিদার। কিন্তু ওঁরা যতটা উচ্চ আত্মপরিচয়ের মর্যাদার দাবিদার ততটার ভাগিদার নন।

একই কথা খাটে ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ বাল্মীকি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। মূলত উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট ভিত্তিক অবহেলিত শ্রেণীর বাল্মীকি সম্প্রদায় নিজেদের রামায়ণ রচয়িতা ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বাল্মীকির বংশধর বলে দাবি করে। তথ্য বলছে ইংরেজরা এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের শহুরে এলাকার সাফাই কর্মী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তুলে এনেছিল। তখন থেকেই এরা মূলত শহরবাসী। এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের এখনো ঘাড়ে করে মলের টিন বইতে দেখা যায়। এই আধুনিক যুগে অনেকেই শিক্ষায় দীক্ষায় এগিয়ে গেলেও এখনও এই জনগোষ্ঠীর মানুষ তথাকথিত এগিয়ে থাকা মানুষদের কাছে অস্পৃশ্য বলে গণ্য হয়।

রাজবংশী সম্প্রদায় নামে পরিচিত অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চল, দিনাজপুর, বগুড়া জেলার একক বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এক সময় আত্মপরিচয়ের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ফলস্বরূপ এই সম্প্রদায়ের মানুষদেরও যে এক সময় অস্পৃশ্যতা নামে হিন্দু সমাজের ভয়ঙ্কর ব্যাধির শিকার হতে হয়েছিল। এই সমাজের প্রাণপুরুষ রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনের কয়েকটি ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ইংরেজ-শাসিত রংপুরে ব্যবহারজীবী হিসেবে কাজ করার সময় একদিন তাড়াহুড়ো করে ভুলবশত সহকর্মী মৈত্র মশায়ের ‘টোগা’ পড়ে জজ কোর্টে মামলা লড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ভুল বুঝতে পেরে সেটি ফেরত দিতে গেলে কিছু মন্তব্য করে সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন মৈত্র মশাই। সবমিলে যার অর্থ দাঁড়ায় রাজবংশীদের মতো অস্পৃশ্য লোকের ব্যবহার করা টোগা তাঁর মতো উচ্চবংশীয় মানুষ ব্যবহার করতে পারেন না। সে সময়ের অরেকটি ঘটনা মনীষী পঞ্চাননকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। রংপুর নর্মাল স্কুলের কয়েকজন আবাসিক রাজবংশী ছাত্র বোর্ডিং-য়ের রান্না ঘরে ঢুকে রান্না হয়েছে কিনা রাধুনিকে জিজ্ঞেস করে। ‘অস্পৃশ্য রাজবংশীদের ছোয়ায় রান্নাঘর অশুচি হওয়ার’ প্রতিবাদে তথাকথিত উচ্চবংশীয় কয়েকজন আবাসিক ছাত্র সেই খাবার ফেলে দিয়ে রাঁধুনিকে নতুন করে রান্না করতে বাধ্য করে। অনেক গবেষকের মতে এই সমস্ত ঘটনা মনীষী পঞ্চাননকে রাজবংশী সমাজের ব্রাত্যত্ব ঘোচানোর কাছে

সমর্পণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলেছিল।

মনীষী পঞ্চানন বয়সে স্বামী বিবেকান্দের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট ছিলেন। এই দু'জনকেই ভারতবর্ষের এক ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। একদিকে অস্পৃশ্যতা, পুরোহিত তন্ত্র, সঙ্কীর্ণ লোকাচার, যুক্তিহীন আচারসর্বস্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে আসা আধুনিক বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি খৃষ্টধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, আচার আচরণের বিরুদ্ধে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের রাষ্ট্রযন্ত্রের আনুগত্যে চলতে থাকা তীব্র বিষোদ্গার। এই পরিস্থিতিতে এদেশের মেধাবী পড়ুয়া থেকে শুরু করে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সমাজ সংস্কারকদের অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন ভারতের উন্নতির রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয়ত্ব বিসর্জনের মধ্যে। ফলস্বরূপ মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৩২ সাল), কৃষ্ণমোহন ঘোষের মতো সে সময়ের মেধাবী ছাত্ররা হিন্দুধর্ম ছেড়ে খৃষ্টধর্মে, ভারতীয় সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে পরিচিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেনের মতো ব্যক্তিরাও রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলেন। পরের দশকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো সাহিত্য স্রষ্টাও একই পথ অনুসরণ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন।

এ সময় স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তিহীন লোকাচার, দেশাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে যুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে হিন্দুধর্মকে ব্যাখ্যা করলেন।

পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটা।

বিশ্বের দরবারে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিন্দুত্বকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ছুটে গিয়েছিলেন চিকাগোর ধর্ম মহাসভায়। খুব অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হবে ভারতবর্ষের হারিয়ে যাওয়া আত্মসম্মান, আত্মগৌরব, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার কাজই হয়ে উঠেছিল বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৯০১ সালে মনীষী পঞ্চানন যখন ওকালতি করার জন্য রংপুরে পৌঁছলেন সেখানেও তিনি দেখলেন দরিদ্র রাজবংশীদের অনেকেই মুসলমান (নব্য মুসলমান) ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের তৎপরতার জন্য অনেকে খৃষ্টধর্মও গ্রহণ করছে। হিন্দু ধর্মের অস্পৃশ্যতার চাবুকে রক্তাক্ত হয়েও সংস্কৃতের পণ্ডিত স্বধর্মনিষ্ঠ মনীষী পঞ্চানন ড. বি আর আম্বেদকরের মতো স্বধর্ম ত্যাগের পথে না গিয়ে ধর্মের মূল স্রোতে থেকেই রাজবংশী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলেন। সাময়িক লাভ হলেও নিজের ধর্ম সংস্কৃতি ছেড়ে কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর পক্ষে কালের প্রবাহে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়, আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের মতোই মনীষী পঞ্চাননের দূরদৃষ্টিতে এই বিষয়টি ধরা পড়েছিল। সময়ের সঙ্গে যা আজ সত্য বলে প্রমাণিত।

সে সময় রাজংশী সমাজের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার কাজটি সহজ ছিল না। কারণ ধর্মীয়, পৌরাণিক, লোককথা ও সাহিত্যে পৌণ্ড্র দেশ বা পৌণ্ড্রজাতির উল্লেখ থাকলেও রাজবংশী জাতিবাচক শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাক্ মুসলমান এবং মুসলমান শাসনের সূচনা পর্বের গ্রন্থাদিতেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইংরেজ শাসনের সূচনালগ্ন থেকে সরকারি নথিপত্রে কোচ শব্দটির উল্লেখ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতে কোচদের কথা উল্লেখ থাকলেও কোথাও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উল্লেখ নেই। নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু প্রকাশিত বঙ্গের জাতি পরিচয় নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থেও উল্লেখ নেই রাজবংশী জাতিবাচক গোষ্ঠীর। কামতাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যেন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিচয়ের তাত্ত্বিক সঙ্কট দেখা যায়। তবে রাজবংশী নাম গ্রহণের আগে এই জনগোষ্ঠী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত ছিল এব্যাপারে রাজবংশী ক্ষত্রিয় লেখকদের মধ্যে দ্বিমত নেই বললেই চলে। সম্মানসূচক পরিচয়

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

আদায়ের জন্য এই জনগোষ্ঠীর চিন্তাশীল ব্যাক্তিরা রাজবংশী শব্দটির প্রচলন করেন এমনটা মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকেই। এই সম্মানসূচক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য এই সমাজের নেতৃস্থানীয়রা ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে ১৮৮১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত জনগণনায় শুধু রাজবংশীক্ষত্রীয় শব্দটি উল্লেখের দাবিতে একটানা স্মারকলিপি দিয়ে গেছেন।

এক সময় এই এলাকায় জনসমাজ বলতে রাজবংশী সমাজকে বোঝালেও মুসলমান ও বৃটিশ শাসনের সূত্র ধরেই মূলত এখানে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা বসবাস করতে শুরু করে এবং সূচনা হয় অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের। এই পরিবর্তনের জেরে চিরাচরিত রাজবংশী সমাজে ভাঙ্গন শুরু হয়। প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে থাকে রাজবংশী সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের। রংপুরে ব্যবহারজীবী হিসেবে কাজ করার সময় মনীষী পঞ্চাননের মতো উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত মানুষকে যেভাবে সহকর্মী ব্যবহারজীবীদের কাছ থেকে অস্পৃশ্য আচরণের শিকার হতে হয় তাতে একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা সে সময় রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসেবে মেনে নেওয়ার বদলে এই সমাজের মানুষদের অস্পৃশ্য, অন্তজ, অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর মানুষ হিসেবে গণ্য করতো। ফল স্বরূপ ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে এই সমাজের মানুষের মধ্যে।

১৮৮১ সালের জনগণনায় রাজবংশী ও কোচেদের একই শ্রেণীতে নথিভুক্তি করণের নির্দেশকে কেন্দ্র করে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গঠিত হয় 'রংপুর ব্রাত্য ক্ষত্রীয় জাতির উন্নতির বিধায়নী সভা'। রাজবংশী সমাজের মানুষ যাতে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্ক অবহিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সময় এই সমাজের জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত মানুষেরা লিখে ফেললেন 'রাজবংশী কুলপ্রদীপ', 'রাজবংশী কুল দীপিকা'র মতো বেশ কিছু গবেষণা মূলক তথ্য ভিত্তিক বই।

শুরুতে মূলত রংপুর-ভিত্তিক এই আন্দোলনকে সমগ্র উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মনীষী পঞ্চানন। শুরু হলো রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের ব্রাত্যত্ব ঘোচানোর প্রক্রিয়া। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা, বিহার ও অসমের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯১০ সালের ১ মে রংপুর শহরে গঠিত হলো রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি। ১৯১৩ সালের জানুয়ারি (২৭ মাঘ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)

পঞ্চানন বর্মার সহধর্মিনী বিষ্ণুমণি দেবী।

মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষত্রিয় হিসেবে রাজবংশী সমাজের ব্রাত্যত্ব ঘুচানোর জন্য উপবীত ধারণের পর মূলত 'দাস' পদবি ত্যাগ করে সিংহ, বর্মার মতো ক্ষত্রিয় পদবি গ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাত্ত্বিক ভাবে না হলেও সেদিন থেকে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় কিনা এই বিতর্কের ব্যবহারিক মীমাংসা হলো।

'খালি পেটে ধর্ম হয় না' রাজবংশী সমাজে এই বাণীর সার্থক প্রয়োগ করলেন ক্রান্তদর্শী পঞ্চানন। ফলে পৈতা পরিয়ে ও পদবি পরিবর্তনের মতো প্রতীক ধারণের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হলো। ছাত্রাবাস স্থাপন করে রাজবংশী ক্ষত্রিয় ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকার ব্যবস্থা করা, কৃষি নির্ভর এই সমাজের সাধারণ মানুষদের সাহায্য করার জন্য ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করে ঋণের ব্যবস্থা করা, নারী রক্ষা সেবকদল প্রতিষ্ঠা, ক্ষত্রিয় পত্রিকা প্রকাশ, এই সমাজের যুবকদের জন্য শারীরিক সামর্থ্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করার মতো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। শিক্ষিত রাজবংশী ক্ষত্রিয় যুবকদের ক্ষাত্রত্য প্রদর্শনের জন্য, হতে পারে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনা বাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করা, ১৯৩৩ সালে রাজবংশীক্ষত্রীয় সমাজের তপসিলি ভুক্তিকরণের কাজ যার সুফল রাজবংশী সমাজ আজও পাচ্ছে সে সময় মনীষী পঞ্চাননের নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়েছিল।

জন্মসার্ধশতবর্ষে মনীষী পঞ্চাননের মূল্যায়ন করতে গেলে এটা বলতেই হবে যে এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষটির যোগ্য নেতৃত্বে গড়ে উঠা রাজবংশী ক্ষত্রীয় আন্দোলনের জন্যই এই জনগোষ্ঠী হিন্দু সমাজের মূল স্রোতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ক্ষত্রীয় পরিচয় দিতে আজ কতজন গর্ব অনুভব করেন বা আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে ক্ষাত্র তেজের স্ফূরণ ঘটানো এই সমাজের কত শতাংশের জীবনের লক্ষ্য এটা বলা না গেলেও রাজবংশী পরিচয় দিতে যে এখন অনেকেই গর্ব অনুভব করেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মনীষী পঞ্চানন না জন্মালে এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ হয়তো মুসলমান বা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যেত আর বাকি অংশ এখনো টোডা বা বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মতো আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে ভুগতে ভুগতে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় হিসেবে কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিত। রাজবংশী ক্ষত্রীয় আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছিলেন, এই আন্দোলনের জন্যই উত্তরবঙ্গের হিন্দু সমাজ রক্ষা পায়। সে সময় হিন্দু সমাজ রক্ষা না পেলে দেশ ভাগের পর এই প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গ ভারতের অংশ থাকতো কিনা সন্দেহ।

মনীষী পঞ্চানন বর্মার দৈনন্দিন জীবনচর্যা

ড. দীপক কুমার রায়

উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তরপূর্ব ভারতের সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসে পঞ্চানন বর্মার আবির্ভাব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কোচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙ্গার অন্তর্গত খলিসামারী গ্রামের দিনদরিয়ার ক্ষেত্রধারায় লালিত পঞ্চানন। গ্রাম্যজীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠেন তিনি। শৈশব থেকে যা দেখেছেন তা উপলব্ধি করেছেন যুক্তি দিয়ে। তদুপরি পিতা-মাতার দৈনন্দিন জীবনচর্যা শৈশব থেকে পঞ্চাননকে প্রভাবিত করেছে, যা পরবর্তী জীবনে সামাজিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়ার পথে উজ্জীবিত করেছে। অর্থাৎ পঞ্চাননের দৈনন্দিন জীবনচর্যা তাঁকে নিজস্ব মহিমায় উন্নীত হতে বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছে। পঞ্চানন জীবনীকার উপেন্দ্রনাথ বর্মন লিখেছেন—

"পিতা খোসাল চন্দ্র সরকার দৃঢ়চেতা, তেজস্বী ও নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। খলিসামারী গ্রামে প্রবহমানা দিলদরিয়া নদীতে স্নান ও তর্পণ করিতেন ও গৃহদেবতা শিবের পূজা করতঃ পরে আহার করিতেন। পতিব্রতা চম্পলাদেবী এই গৃহদেবতার পূজা নিষ্ঠার সহিত যাহাতে সম্পাদিত হয় সেজন্য যত্নশীলা ছিলেন। সন্তান পঞ্চানন পিতা ও মাতার ওই সকল গুণের অধিকারী হইয়া উত্তরকালে আপন কর্মগুণে যশস্বী হইয়াছিলেন।"

দৈনন্দিন জীবনে তিনি ছিলেন সাত্ত্বিক প্রকৃতির, আহারেও শুচিতা পালন করতেন। নিরামিষ আহার ছিল সবচেয়ে পছন্দের। পেঁয়াজ, রশুন খেতেন না। সম্ভবত পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে তিনি এ ধরনের জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। বাইরে কোথাও গেলে তিনি সাধারণত নিরামিষ আহার খেতেন। এছাড়াও রাজবংশী সমাজের দেশীয় খাদ্য ছ্যাঁকা, লাফাশাক, কাঁচা দুধের দই, গুড় চিড়া ছিল তার একান্ত প্রিয়। বাড়ির বাইরে গেলেই সাধারণ স্বপাক আহার খেতেন। নিতান্ত নিরুপায় হলে কোনো বিশুদ্ধ সহচরের রান্না করা খাবার গ্রহণ করতেন।

পঞ্চানন বর্মা

পঞ্চানন বর্মার দৈনন্দিন জীবনচর্যার অন্যতম দিক হলো প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠা এবং স্নান করা। অতঃপর ইষ্ট চিন্তা, স্তব ইত্যাদি নিত্য কর্ম। এছাড়াও প্রাতঃভ্রমণ করতেন তিনি। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় রংপুরে ওকালতি করতে এসে তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের উপবীতের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষায় তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং নিয়ম রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এমনকী মাথার পাগড়ি সযত্নে রাখতেন। পোশাক পরিচ্ছদেও মনীষী পঞ্চানন বর্মার কোনো বাহুল্য ছিল না। ধুতি এবং ফতুয়া ছিল তাঁর সাধারণ পোশাক। শুভ্রবেশ, বিশেষত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে তিনি বিভিন্ন সভায় যেতেন, এছাড়াও তিনি কোট-প্যান্ট ব্যবহার করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখায় তিনি সাধারণত কোট-প্যান্ট পরে; আবার কখনো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাজির হতেন। অসমের ধুবড়িতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্মেলনে ওই জেলারই চোড়োইখোলা নামক একটি সভা এবং বন্ধাইগাঁও জেলার বামেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তিনি কোট প্যান্ট পরে সভার কাজ পরিচালনা করেন।

পঞ্চাননের সহকর্মী তথা অন্যতম ক্ষাত্র নেতা তরণীকান্ত সরকার লিখেছেন—

"ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা আজীবন হিন্দুধর্মের যাবতীয় আচার ও রীতিনীতি মানিয়া চলিতেন। তিনি সর্বদা নিরামিষ আহার পছন্দ করিতেন। পবিত্র গঙ্গাজল, তুলসীপাতা ও গীতা তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল। তিনি সর্বদাই দেশ বিদেশে ভ্রমণকালে এবং প্রবাসে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিতেন।"

মনীষী পঞ্চানন বর্মার মধ্যবয়স থেকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যার সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। এ সময় বাড়িতে থাকাকালীন তিনি কাঠের খড়ম ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। কেবল মাত্র নেতা বা কোনো অতিথির বাড়িতে গেলে রাজবংশী সমাজের রীতি অনুযায়ী সামান্য একটু পান ও গুয়া তিনি মুখে দিতেন। তবে চা-পান ও ধূমপান করতেন না। জানা যায় জীবনে কোনোদিন তিনি মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেননি।

তিনি ছিলেন নির্ভীক চিত্তের মানুষ এবং স্পষ্ট বক্তা। যা অনুভব করতেন তা খুব সহজেই প্রকাশ করতেন। শিবেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল পঞ্চাননের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন— বিভিন্ন ক্ষত্রিয় সমিতির সভায় পঞ্চানন দেশি ভাষায় বক্তব্য দিতেন। অর্থাৎ মাতৃভাষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। সকলের মতো সে

ভাষাতেই আলাপ আলোচনা করতেন।

ক্ষেত্রনাথ সিংহ উল্লেখ করেছেন—

"সাহসী চরিত্রই তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিত। উদারতা ও মহত্ত্বগুণে তাঁহার চরিত্র আরও মনোরম হইয়া উঠিত। তাঁহার ছিদ্রান্বেষীরাও চরিত্রের এই বিমলতায় সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিত।"

ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়ো নির্বিশেষে তিনি সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করতেন। সেজন্য তিনি জীবিত অবস্থায় শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। শুধু তাই নয়, নিয়মিত চিঠি লিখে যোগাযোগ রাখতেন তিনি। অসমের বঙ্গাইগাঁও জেলার ধলাগাঁও নিবাসী হরকিশোর অধিকারীর সঙ্গে পঞ্চাননের নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। এছাড়াও উপেন্দ্রনাথ বর্মন শশীভূষণ ফৌজদার প্রমুখের সঙ্গে পঞ্চাননের পত্র বিনিময় হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সে চিঠিগুলি পাওয়া যায়নি। পঞ্চাননের সমস্ত চিঠি আবিষ্কৃত হলে দৈনন্দিন জীবনচর্যার আরো অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

জাতি ও দেশের সেবায় তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শক্তি সঞ্চারিণী দেবীর কাছে জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি সর্বদা প্রার্থনা করতেন। এ বিষয়ে পঞ্চানন সম্পর্কিত নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি প্রত্যহ দেবীর কাছে কায়মনোবাক্যে রাজবংশী সমাজের উন্নতির কথা জানাতেন এবং সমাধানের উপায় খুঁজতেন। অর্থাৎ জাতির সেবায় তিনি কতখানি মনোনিয়োগ করেছিলেন এবং দৈনন্দিন জীবনচর্যায় কত গভীরভাবে সমাধানের পন্থা অন্বেষণ করতেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করতেও তিনি পিছুপা হতেন না। ভ্রমণেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

আজীবন তিনি কথায় ও কাজে এক ছিলেন। তাই তিনি বলতেন—

যার কাথা এক, স্বর্গে মত্যে ঠেক
যার কাথা দুই, তাক হুত্তি নিগি থুই
যার কাথা তিন তাক দেখি নাগে ঘিন

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি এগিয়ে এসেছেন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে। সেখান থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি নিজে ছিলেন সংস্কৃতে এমএ। সেই সূত্র ধরে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করে নিজের যুক্তিকে প্রতিপন্ন করেছেন। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের ঐতিহ্য তথা ভারতীয়ত্ব তাঁর মনে ছিল সদা জাগ্রত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখার বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে তাঁর এই দৃঢ়তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেছেন—

'তোর আশা সগায় করুক, তুই যেন কারো আশা না করিস।'

এই বক্তব্য পঞ্চাননের জীবনে অন্যতম বেদবাক্য। এর মধ্য দিয়েও তার জীবনের উদারতা ও মহত্ত্বকে উপলব্ধি করা যায়। গোবিন্দ মিশ্রের গীতা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই পুঁথি বিষয়ক একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রকাশ করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখার পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে তিনি গোবিন্দ মিশ্রের গীতা যে ঘরে ঘরে পঠিত হতো সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, মনীষী পঞ্চাননের জীবনচর্যায় গীতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। গীতার বাণীকে আদর্শ করে তিনি সমাজ সেবায় এগিয়ে আসেন। দৈনন্দিন আচারনিষ্ঠা ও জীবনচর্যায় গীতার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পঞ্চানন তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছেন ওকালতি দিয়ে ১৯০১

১৯৩০ সালের পর রংপুর জেলায় নানা অংশে নারী ধর্ষণ ও অপহরণ ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ধর্ষিতা ও অপহৃতা স্ত্রীলোকের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়েছিল। সমাজ সংস্কারক পঞ্চানন বর্মার হৃদয় তাতে কেঁপে ওঠে। তিনি 'ডাংধরী মাও' কবিতার মাধ্যমে সমাজের জাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেন।

চম্‌কি উঠিল ডুকরণ শুনি, ডাংধরী মোর মাও।
দিশাদুওর নাই খালি কোল্লহার, দেখে সংসারের ভাও।।
সোয়ামীর কোলা, বাপ ভাইর ঘর, আর যেইটে নারী থাকে।
জোর করিয়া নুচ্ছাগুন্ডায় নিয়া যাইতেছে তাকে।।
বেটা ছাওয়াগুলা উঠিয়া আইসে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ফ্যাল্ চায়।
ডাংধরী মাও, কোর্দ্ধে হাকি, গাইন ধরিয়া ধায়।।

বেটা ছাওয়ার প্রতি—

ছিকো ছিকো রে মরা বেটা ছাওয়া, ধিক্ ধিক্ তোক্ ধিক্
মাও বইনক তোর পরে নিগায়, তেঞো থাকিস্ তুই ঠিক।
আরে মরদ্ মরদ্ কওলাইস রে তুঞি কেমন তোর মর্দানি।
কেবল পাথার বাড়ী হাতে আসি, মাইয়ার আগ্‌ত কেরদানী?
লাজ নাই তোর, হিয়াও নাই তোর, বল্ নাই তোর ধড়ে।
এই বাদে তোক্ টেপো বউ ছিকো ছিকো করে।।
কেবল দুষ্টাদমন মোকদ্দমায়, ফিরে না ধরম মান।
ভাঙ্গি নুচ্ছার হাড়, মাও বইনের রক্ষা, বাপের বেটার কাম।।
রাখির না পারিস, মাও বইনক যদি আপন বাহুবলে।
পাপের বোঝা বইছিল মাও তোর, এই দশা তার ফলে।।
আয় আয় রে, ক্ষত্রিয়গুলা, তোমাক ডাকোঁ বারম্বার।
তোমার কান নাই কি, অন্তর নাই কি কান্দন শুন্‌বার?
হউক না কেনে দূর দূরান্তর, পর্ব্বত নদী মাঝে।
ক্ষত্রিয় যদি ঠিক হইস্ তুঞি, তেঞো শুনুবু কাছে।।
আতুরা কান্দন ক্ষত্রিয় কানে আপ্‌নে আসি নাগে।
হিদ্দে উঠে হুড়কা তুফান, শরীলে শক্তি জাগে।।
আতুরা কানন্দ, ক্ষত্রিয় কানে আপ্‌নে আসি নাগে।
হিদ্দে উঠে হুড়কা তুফান, শরীলে শক্তি জাগে।।
পাঞোএর ডরে পাহাড় ডাঙ্গে, ফিরিয়া না চায় বীর।
দুষ্টাক মারি আর্ত্তক তারি, তবে সে হয় রে থির।।

(সংক্ষেপিত)

সালে রংপুরে। তারপরে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন সাহিত্য সংস্কৃতির কাজে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাস থেকে প্রকাশিত রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন। পত্রিকা সম্পাদনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কামরূপ কামতার ইতিহাস, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি তাঁর চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। অতঃপর ক্ষাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পঞ্চানন সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। ১৯১৫ সালে ১ মে রংপুর নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় ক্ষত্রিয় সমিতির প্রথম সম্মেলন, সভাপতিত্ব করেন জলপাইগুড়ির উকিল মধুসূদন রায়। অবশেষে ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থী হিসেবে পঞ্চানন বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। বিধান পরিষদে সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। এই পর্বেও বিভিন্ন বক্তৃতায় তাঁর জীবনাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে এসেছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবে।

মনীষী পঞ্চাননের জীবনচর্যার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো সংযম, শুচিতা, দৃঢ়তা ও উদারতা— দৈনন্দিন জীবনচর্যাতেও তা পরিলক্ষিত হয়। জাতির উদ্দেশে তিনি বলেছেন—

''আমরা মান ও অপমান ত্যাগ করিয়া, রাগ ও দ্বেষ ছাড়িয়া সমাজের মঙ্গল একমাত্র মঙ্গল ভাবিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে ধীরস্থির নির্মল চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোচনা করিব। যে মতটি সমাজের মঙ্গলকর বলিয়া, সকলের অথবা অধিকাংশের নিকট প্রতীয়মান হইবে, তাহাই আত্মগত তাহাই সমাজের আকাঙ্ক্ষিত— মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিব। ক্ষুদ্র আমার মতটি বৃহৎ আমার অর্থাৎ সমাজের মতে উপহার দিব। নিজের অভিমান পরিতৃপ্তির জন্য যেন সমাজের শক্তির অনুমাত্র হ্রাস না করি।''

উত্তরপূর্ব ভারতের সামাজিক আন্দোলন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে পঞ্চাননের ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে তাৎপর্যপূর্ণ। তাই রায়সাহেব পঞ্চানন 'ঠাকুর পঞ্চানন', 'লোকরঞ্জন পঞ্চানন', 'মনীষী পঞ্চানন' ইত্যাদি নানা অবিধায় অভিহিত। সার্ধজন্মশতবর্ষের প্রেক্ষাপটে মনীষী পঞ্চাননের ভাবাদর্শ তথা জীবনাদর্শ পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়ন অবশ্যই কাম্য। মনীষী পঞ্চাননের মহানুভবতা, জীবনচর্যার নানা দিক আলোচনা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়েই খুঁজে পাওয়া যাবে মনীষী পঞ্চাননকে একটি মহান জীবনাদর্শকে।

তথ্যসূত্র :

১. উপেন্দ্রনাথ বর্মন, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত, ১৪১৬, পৃ. ১।

২. প্রাগুক্ত পৃ. ৭।

৩. ড. সুখবিলাস বর্মা, রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা, পঞ্চানন স্মারক বক্তৃতামালা ৪, ৫, মাথাভাঙ্গা পঞ্চানন স্মৃতিরক্ষা সমিতি এবং জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটি ১৪২০, পৃ. ১১।

৪. তরণীকান্ত সরকার, সমাজ দার্শনিক রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা, ১৪০১ পৃ. ১৩।

৫. লেখক ক্ষেত্রনাথ সিংহ, সম্পাদনা ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল, রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনী বা রঙ্গপুর ক্ষত্রিয় সমিতির ইতিহাস, ২০০৮ পৃ. ১০২।

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

ইতিহাস অনুসন্ধানী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা

দেবব্রত চাকী

অবিভক্ত বাংলার উত্তরভাগ, যা উত্তরবঙ্গ নামে বহুকাল আগে থেকে পরিচিত— সেই বিস্তীর্ণ এলাকা, পাশ্ববর্তী অসমের গোয়ালপাড়া (পড়ুন সাবেক উত্তর-পূর্ব রংপুর এলাকা) জেলা এবং ইংরেজ আশ্রিত করদ মিত্ররাজ্য কোচবিহারের সমাজ জীবনে ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগ ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যিনি বাংলার বিদ্বৎ সমাজের সমীহ আদায় করে নিয়েছিলেন তিনি পঞ্চানন সরকার। কোচবিহারের মাথাভাঙা মহকুমার খলিসামারী গ্রামের খোসাল সরকার ও চম্পলাদেবীর পুত্র পঞ্চানন ক্ষাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পরিচিতি লাভ করেন ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা নামে। পরবর্তীকালে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী পঞ্চানন বর্মাকে ইংরেজ শাসকবর্গ 'রায়সাহেব' উপাধি প্রদান করে। যাই হোক, পঞ্চানন বর্মা আমাদের কাছে রাজবংশী সমাজ সংস্কারক হিসাবেই সমধিক পরিচিত। একদা কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের হোস্টেল সুপার, পরবর্তীকালে পেশায় আইনজীবী পঞ্চানন বর্মা সাহিত্য অঙ্গনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'রংপুর সাহিত্য পরিষৎ' আত্মপ্রকাশের পরবর্তী বছরে পরিষদের একটি নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়। 'রংপুর শাখা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' পরিচালনা ও অন্যান্য গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য ৫ সদস্যের 'গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতি' গঠিত হলে তার অন্যতম সদস্য হন পঞ্চানন সরকার (১৯০৬ সাল)। সেইসঙ্গে তাঁকে পত্রিকা সম্পাদক পদে বরণ করা হয়। শুরু হয় পঞ্চানন বর্মার সাহিত্য সাধনা, যা তাঁকে এক অন্যমাত্রায় উন্নীত করে।

(২)

পঞ্চানন বর্মার সাহিত্য সাধনার অন্যতম অভিমুখ হলো ইতিহাসনির্ভর প্রবন্ধ রচনা— সাবেক পশ্চিম কামরূপ কিংবা কামতা বা পরবর্তীকালের প্রাচীন কোচবিহারের ইতিহাস অনুসন্ধান করে তা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ। তিনি যে সকল ঐতিহাসিক বিষয়কে তাঁর রচিত প্রবন্ধাদির মধ্যে তুলে আনবার চেষ্টা করেছেন তার অনেকগুলিই অনালোচিত। পঞ্চানন বর্মার ইতিহাস সন্ধানী মননশীলতা বর্তমান প্রজন্মের কাছে সম্পদ স্বরূপ। যেমন তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'গোবিন্দ মিশ্রের গীতা'। তিনটি প্রবন্ধ একই শিরোনামে তিনি 'রংপুর শাখা সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রথম প্রবন্ধ তিনি ১৩১৪ বঙ্গাব্দে পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে প্রাচীন কোচবিহার রাজ্যের জনজীবনে ধর্মীয় আবহের একটি চিত্র তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন— ''অদ্য যে গ্রন্থের পুঁথি প্রদর্শন করিতেছি, সে গ্রন্থখানি 'গোবিন্দ মিশ্রের গীতা', অথবা কেবল 'গীতা' বলিয়া এতদ্দেশে জনসাধারণের নিকটে সুপরিচিত। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, ধুবড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষত ব্রাত্যক্ষত্রিয়েরা এই গীতার এক একখানি পুঁথি নিজ নিজ গৃহে রাখা পরম পুণ্যজ্ঞান করেন এবং প্রায় সদ্‌গৃহস্থমাত্রেই এক একখানি পুঁথি পরম যত্নে নিজ গৃহে রাখিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস, গৃহে গীতা রাখিলে বিগ্রহ স্থাপনের ফললাভ হয়। এই গীতা গৃহদাহনে পুড়িয়া যায় না। এই গীতা গৃহস্থের অশেষ বিপদ নাশ করে। এই পরম পবিত্র গীতার নিত্যাবৃত্তি পরম পুণ্যপদ প্রদান করে। শ্রদ্ধাবান ধার্মিক ব্যক্তিরা প্রত্যহ আহ্নিককৃত্য সময়ে এক বা ততোধিক অধ্যায় পাঠ করিয়া আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করেন। যিনি গীতা অধিগত করিয়াছেন, তিনি পরম জ্ঞানী, পরম সাধু; অনেকে পুঁথি না দেখিয়া মুখে মুখে গীতা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সুখে, দুঃখে ইহা বৃদ্ধ মনুষ্যের পরম বন্ধু এবং আশ্রয়স্থল। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা গীতার পদ আবৃত্তি করিয়া চিত্তের সমতা সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং অপরের দুঃখে ও বিপদে গীতার পদ উদ্ধৃতি করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।'

পঞ্চানন বর্মা তাঁর প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেছেন, ''ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার সময়ে স্বর-সংযোগে গীতা পাঠ ও তচ্ছ্রবণ নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগের একটি নিত্য কর্তব্য ছিল।'' অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় আবহ যে 'গোবিন্দ মিশ্রের গীতা'-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো তা পঞ্চানন বর্মা তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেইসঙ্গে গোবিন্দ মিশ্রের গীতার তিনটি পুঁথি বিশ্লেষণ করে তার মর্মার্থ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। গোবিন্দ মিশ্র সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল

ছিল যথেষ্ট। পুঁথিতে গোবিন্দ মিশ্র তাঁর পরিচয় দিয়ে যান নাই। পঞ্চানন বর্মা চেষ্টা করেছেন গোবিন্দ মিশ্রের প্রকৃত পরিচয় ও তাঁর বাসস্থান খুঁজে বের করতে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, গোবিন্দ মিশ্র ছিলেন দামোদর দেবের শিষ্য। জাতিতে ব্রাহ্মণ গোবিন্দ মিশ্র হয়তো বা ভক্তাবতার দামোদর দেবের সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন। যদিও ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় যে, গোবিন্দ মিশ্র সম্ভবত ছিলেন মৈথিলী ব্রাহ্মণ। তিনি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সভাকবি ছিলেন। মহারাজের ইচ্ছায় ও গুরু দামোদর দেবের নির্দেশে শ্রীমদ্ভগবত গীতাকে কামরূপী ভাষায় অনুবাদ করেন, যার মধ্যে কামতাবিহারী বা কুচবিহারী ভাষার প্রভাব যথেষ্ট। পঞ্চানন বর্মা উল্লেখ করেছেন যে, গোবিন্দ মিশ্র রচিত পুঁথিতে কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক বহু পদ আছে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক একটি পদও নাই। গোবিন্দ মিশ্রের বাসস্থান সম্পর্কে তিনি কিছু সূত্রের নির্দেশ করে গেছেন। তোর্সা নদীর দক্ষিণ তীরে পুরনো রেল স্টেশনের নিকট মেধীবাড়িকে তিনি নির্দেশ করেছেন। ইতিহাস অনুসন্ধানে যতটুকু জানা যায় যে, মহাপুরুষ দামোদর দেবের স্থাপিত বিভিন্ন সত্রের সেবাইত হতেন তাঁর শিষ্য-অনুগামীরা, যাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। সেবাইতরা ‘মেধি’ উপাধি লাভ করতেন। মেধী উপাধীধারী জনৈক উত্তরাধিকারীকে মহারাজ রূপনারায়ণ প্রদত্ত একক শ্রীকৃষ্ণ বা গোপীনাথ বিগ্রহ সাবেক গুড়িয়াহাটি বা বর্তমান কোচবিহার শহরের দক্ষিণ ভাগে গৃহদেবতা হিসাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্রীশ্রী গোপীনাথ-জগন্নাথ নামাঙ্কিত উক্ত দেবত্র বিগ্রহ রাজ আমলের পরম্পরা অনুসারে আজও কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট রোর্ড থেকে মাসিক অনুদান লাভ করে আসছেন।

(৩)

পঞ্চানন বর্মার ইতিহাস অনুসন্ধান বিষয়ক আরো দু'টি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় যার একটি ১৩২৭ সালে ধুবড়ীতে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয় সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের ভাষণ এবং অপরটি ১৩১৯ সালে রংপুর সাহিত্য পরিষদের সপ্তম বর্ষের সভায় ‘কামতা অনুসন্ধান সমিতি’ গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব। তাঁর এই দু'টি রচনার মধ্যে তিনি ঐতিহাসিক বিষয় সমূহকে যথাযথ অনুসন্ধান পূর্বক সংকলিত করবার উপর জোর দিয়েছেন। পঞ্চানন বর্মা ‘কামতা অনুসন্ধান সমিতি’ গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কিত রচনায় উল্লেখ করেছেন, ‘‘বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি অচিন্তিত রূপে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার ইতিহাসের আদিকাণ্ড ‘গৌড়রাজমালা’ রচনা করিয়াছেন। বাংলায় মুসলমান রাজত্বের পূর্বে হিন্দু রাজত্বের কথা বড় বেশি আলোচিত হয় নাই। আমরা আজ সেইকালের একটা ধারবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতেছি। ইহা কম কথা নহে।’’

পঞ্চানন বর্মার এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের একটি ইতিবাচক দিক। তিনি তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যেও যে ইতিহাস অন্বেষণ জারি রেখেছিলেন তা আজকের প্রজন্মের কাছে বার্তা স্বরূপ। পঞ্চানন বর্মার জন্মসার্ধশতবর্ষে তাঁর মননশীলতার এই দিকটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। ▌

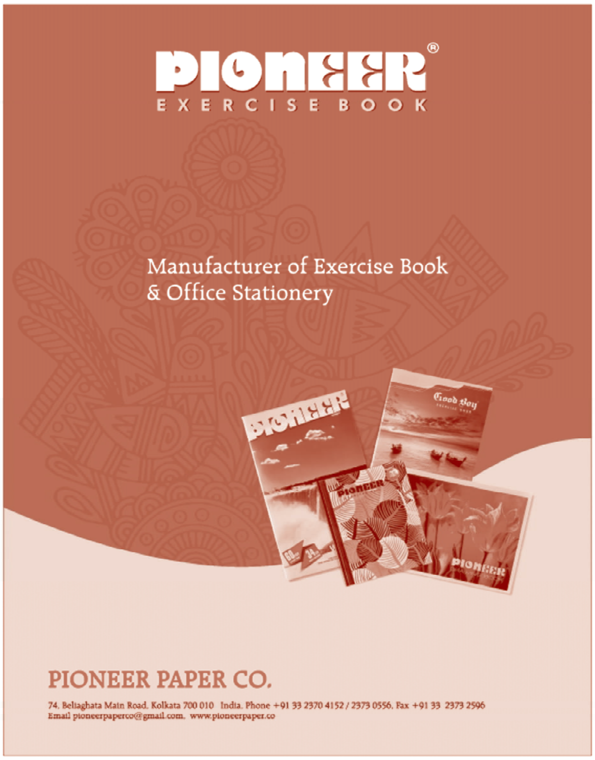

নেত্রদান মহাদান

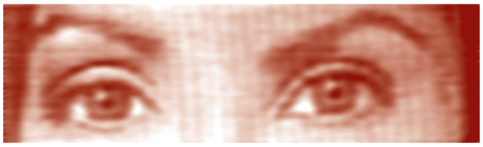

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

শ্রীকৃষ্ণাবতার : সমাজ পুরুষের অস্ত্রোপচার

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণবদের মতে শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, পরমব্রহ্ম। যাহোক, অবতার-পরম্পরা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নরসিংহ অবতার থেকে শ্রীরামাবতার পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ক্রমশ বিকাশলাভ করেছে এবং রামচন্দ্রের সময় তা আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীরামচন্দ্র জাতীয়তাবাদের চরম কথাটি বলে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। আর একটি বড় কাজ শ্রীরামচন্দ্র করেছিলেন— রামরাজ্য স্থাপন অর্থাৎ আদর্শ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই সময়ে ভারতীয় সমাজে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। তা হলো, শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি নির্মাণ। বিষয়টি উপলব্ধ হলেও সম্পন্ন করার অবসর পাওয়া যায়নি। রামচন্দ্রের অন্তিম জীবনের হতাশা ও অকস্মাৎ দেহত্যাগ এর কারণ।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামরাজ্যও বিনষ্ট হয়। রামচন্দ্রের উত্তরাধিকারীগণ যে কেমন অপদার্থ ছিলেন, তা কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যপাঠে জানা যায়। সেই সময় রামচন্দ্রের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়পরবশ, স্বার্থপর, ভোগাসক্ত রাজারা প্রজাশাসনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। শ্রীরাম থেকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পর্যন্ত ভারতে কোনো রাজচক্রবর্তী সম্রাটের আবির্ভাব ঘটেনি। রাজা বলতে তখন কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি নরপশু। এই সব রাজা প্রজাপালন তো দূরের কথা প্রজাপীড়ন ভিন্ন কিছু জানতেন না। এই সময়কার সমাজের আর একটি সুন্দর চিত্র আমরা পাই বকাসুরের কাহিনিতে। বকাসুর ও তার জনাকয়েক অনুচর সেই সময় নগরে নগরে যে অত্যাচার করে বেড়াতো তা বর্ণনা করা যায় না। দেশের মানুষ এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার কথা কল্পনাতেও আনেনি। বরং তারা এই অসুরদের নিত্য ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল— এক গোরুর গাড়ি ভর্তি ভাত; দুটি মোষ ও একটি মানুষ। সেই সময় সমাজের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, এই অত্যাচার একটি দেশে অবাধে দীর্ঘদিন চলেছিল। যাহোক, মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন বকাসুর বধ করে দেশকে রক্ষা করেন।

দেশের এইরকম পরিস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করার জন্য তিনি এই ধরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল থেকেই নানাবিধ অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দমন করেন। পুতনা বধ, অঘবধ, কালীয়দমন, গোর্বধন-উত্তোলন প্রভৃতি নানাবিধ কার্য সমাধা করে তিনি সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়েছিলেন। পরে কংসবধও তিনি সম্পন্ন করেন। কিন্তু তখনও তিনি নিজ কর্তব্য স্থির করেননি। ঋষি সন্দীপনের আশ্রমে শিক্ষা গ্রহণের সময় দেশের ও জাতির অবস্থা গভীরভাবে বিশ্লেষণের পর তিনি পরবর্তী কর্তব্যকর্ম স্থির করেন। পরশুরামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সমাজে একটি নতুন নীতি প্রবর্তন করেন— সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজ মন্দ হয় না; একটি সীমা পর্যন্ত ক্ষত্রিয়দের সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। তাই তিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু এতেও যখন তার পরিবর্তন হলো না, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করতে দ্বিধা করেননি। কংসের ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি বজায় রাখেন। জরাসন্ধের ক্ষেত্রেও তাই। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বাধীন কোনো কোনো ক্ষত্রিয় যুদ্ধে লোকক্ষয়ের কথা ভেবে বহু অপমান সহ্য

করেছিলেন। তাদের মধ্যে পাণ্ডবরা অন্যতম। পাণ্ডবরা অনায়াসে কৌরবদের অনেক আগেই পরাজিত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা কৌরবদের বোধোদয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। এটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও যুক্তিশীলতার মাধ্যমে এই সংঘর্ষ ও পারস্পরিক হানাহানি বন্ধ করতে সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় দুর্যোধনের জেদের জন্য। দুর্যোধনের এই জেদের কারণ কি? তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন
যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।।'

—ধর্ম কি, তা আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না; অধর্ম কি তাও আমি জানি, কিন্তু তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারিনি; অন্তরস্থিত কোনো এক দেবতা দ্বারা যে কাজে নিযুক্ত হতাম সে কাজ করতাম। এই অন্তরস্থিত দেবতাটি কে? এটিই কালপ্রবাহে বহমান সংস্কৃতি, অর্থাৎ পূর্বপূর্ব জন্মের সংস্কার— প্রারব্ধ। কোনো ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় বিশেষ কিছু করতে পারে না। ব্যক্তি তো সমাজে এক বুদ্বুদের মতো, পিছনের জলরাশি তাকে সামনে ঠেলে দেয়; আর সামনের পথ আগের জলপ্রবাহে পূর্ব থেকেই সৃষ্ট। সমগ্র সমাজে যে সংস্কার দৃঢ় হয়ে রয়েছে তার সামনে ব্যক্তি নিরুপায়, অসহায়। এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে যে প্রবৃত্তি তৈরি হয় ব্যক্তি সেইমতো কাজ করে। একেই আমরা দৈব, ভাগ্য, নিয়তি ইত্যাদি বলি। আসলে ব্যক্তি সমাজআশ্রিত। সমাজ-রীতি ব্যতীত ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না। একথা শুধু দুর্যোধনের ক্ষেত্রে নয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কালপ্রবাহের বিপরীতে গিয়ে নিজের চোখে দেখা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান তাঁরাও করতে পারেননি। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রকাশ্য দিবালোকে রাজসভাতেই সকলের উপস্থিতিতে ঘটেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টদের সংশোধনের সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সংশোধিত হয়নি। কারণ কালপ্রবাহে বহমান সংস্কৃতি অর্থাৎ নিয়তি তাদের বাধা দিয়েছিল। মানুষ সংস্কার অনুযায়ী কাজকর্ম করে। একবার অন্যায়ভাবে ভোগসুখ পেলে ন্যায় পথে ফিরে আসতে পারে না। এই অবস্থায় তাদের বিনাশ ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। এটি এই যুগের একটি মান্য সিদ্ধান্ত। এই যুগে সমাজপতিরা অনুভব করেছিলেন, জন্ম থেকেই ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ, বেদব্যাস, ভীষ্ম, বিদুর সকলেই সমাজ-সংস্কারের অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু ভাঙাবাড়ি অপসারণ না করে যেমন সেখানে নতুন বাড়ি তৈরি করা যায় না, তেমনি সমাজে দুষ্টের বিনাশ ব্যতীত শিষ্টের পালনও অসম্ভব। দুষ্টরা থাকলে সমাজে নতুন প্রজন্মের লোকেদের সুশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। আলুর বস্তায় একটি পচা আলু থাকলে, সর্বাগ্রে তাকে ফেলে দিতে হয়; নচেৎ সমস্ত আলু পচে যায়। দেহে ক্যান্সার হলে অস্ত্রোপচারের ভয় করলে চলে না। নচেৎ তা সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মতো সমাজদেহ সম্পর্কেও সেই একই কথা। শ্রীকৃষ্ণের সময় অর্থাৎ মহাভারতের যুগে সমাজদেহে অস্ত্রোপচার কালপ্রবাহেই নিয়তি-নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কে তাকে নিবারণ করবে? মাতা কুন্তী কর্ণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। কোনো ফল হয়নি। কর্ণ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি সবকিছু বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বলেছিলেন— 'ভাবী বিনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না। পাণ্ডবরা বিজয়ী হবে। কৌরবদের নাশ হবে। অগণিত ক্ষত্রিয় নিহত হবে। কিন্তু কালপ্রবাহ এতে থামবে না। এর বিপরীত হলে আরও বিপত্তি ঘটবে। দুষ্টদের সমাজ থেকে উৎপাটিত করা উচিত। এ কথা সত্য, নতুন যুগের উত্থানের জন্য এই বলিদান প্রয়োজন। আগত সংহার পর্ব দুঃখজনক হলেও আপন কর্তব্য পথ চিনে, সমাজের ভাবী কল্যাণের কথা ভেবে আমরা সহর্ষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো।' যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী— একথা নিশ্চিত হওয়ার পর ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য স্পষ্ট হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ গীতার সাহায্যে অর্জুনকে এই কথাই বলেছিলেন। এখন ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনের সময়; নিজ কর্তব্য পালনই পরম ধর্ম। মোহাবিষ্ট অর্জুনকে তিনি বোঝালেন, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই যোদ্ধাদের মৃত্যুতেই সমাজের কল্যাণ। তাই কর্মফলের চিন্তা না করে কর্ম করো। ভারত যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয় নিধন হলো, ভালো-মন্দ উভয়ই মরলো। সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ল।

এই সামাজিক দুর্বলতা দীর্ঘকালব্যাপী ছিল। সমস্ত দেশ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। কোথাও প্রজাতন্ত্রী রাজ্য গড়ে উঠল। ব্যক্তিবাদ, প্রাদেশিকতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠল। এইরকম সামাজিক বাতাবরণে ব্যাপক রাষ্ট্রভাবনার চেতনা লুপ্ত হলো। স্বর্গলাভের জন্য যাগযজ্ঞের আয়োজন বেড়ে গেল। প্রাচীনকালের যজ্ঞের সুসংস্কৃত রূপটি নষ্ট হলো। সকলেই আগুনে ঘি ঢেলে যজ্ঞ করতে শুরু করল। ফলে যজ্ঞের সমাজহিত ও যথার্থতা নষ্ট হলো। পূজা, সংহতিরক্ষা, দান ইত্যাদি বিশেষ জিনিসগুলি অপ্রয়োজনীয় নিষ্ফল বলে প্রতিপন্ন করা হলো। এসবের তাৎপর্য ও চরিতার্থতা সমাজ বিস্মৃত হলো। এই ভাবে বৈদিক-যজ্ঞের অবনতি ঘটল। এমনই এক সামাজিক ও বৌদ্ধিক অরাজকতার বিচিত্র আবহে— কালান্তর পর্বে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি সমাজে নতুন চিন্তাধারার স্রোত প্রবাহিত করেন। ভারতবর্ষ আবার জেগে ওঠে। তিনি অবতার। কারণ অবতারের কাজ সকল প্রকার পঙ্কিলতা থেকে সমাজকে উদ্ধার করা। ■

প্রথম মহিলা রাজ্যপাল
সরোজিনী নাইডু

রূপশ্রী দত্ত

সরোজিনী নাইডু ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর শাসনক্ষমতা, স্মিত হাস্যমুখ, মধুর ব্যক্তিত্ব তাঁকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিখ্যাত রাজনীতিক, কবি, বাগ্মী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী সরোজিনী নাইডু তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতা। মাতা বরাদসুন্দরী দেবী। অঘোরনাথ হায়দরাবাদের নিজাম কলেজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক ছিলেন। হায়দরাবাদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনি সদস্য ছিলেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের অভিযোগে তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা হয়। তাঁর জননী বরদাসুন্দরী বাংলা ভাষায় অনেকগুলি কবিতার রচয়িত্রী। তাঁর দুই ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রথমজন কমিউনিস্ট ছিলেন, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে রাশিয়ান সৈন্যদের দ্বারা নিহত হন। দ্বিতীয়জন কবি, অভিনেতা ও নাট্যকার।

সরোজিনী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে কোনো রাজ্যের তিনি প্রথম মহিলা রাজ্যপাল। সরোজিনীর কবিপ্রতিভার জন্য এবং গান রচনায় দক্ষতার জন্য তাঁকে ‘ভারত কোকিলা’ এবং ‘নাইটিঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া’ উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি, উর্দু, ইংরেজি, পার্শী ও তেলুগু ভাষা জানতেন। উচ্চশিক্ষার জন্য কিংস্ কলেজ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। কলেজে তাঁর সঙ্গে ডাঃ মুথাইয়ালা গোবিন্দরাজুলুর পরিচয় হয়। শিক্ষা পর্বের পর ১৯ বছর বয়সে সরোজিনী তাঁকেই বিবাহ করেন। প্রাথমিক পর্বে সে যুগের সমাজে তাঁদের অনেক সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কারণ গোবিন্দরাজুলু অব্রাহ্মণ ছিলেন। অপরপক্ষে সরোজিনী ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। পরবর্তীকালে অবশ্য পরিচিতজনের চোখে তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই দম্পতির দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জয়সূর্য, রণধীর, পদ্মজা ও লীলামণি। পদ্মজা মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্যপাল হয়েছিলেন এবং ‘Feather of the Dawn’ নামে কাব্যসঙ্কলনও প্রকাশ করেছিলেন।

সরোজিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘The Golden Threshold’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থ ‘The Bird of Time’ এবং ‘Broken wing’। তারও পরে লিখেছিলেন— ‘Wijard Mask’ ও ‘Magic Tree’। এছাড়া মহম্মদ আলি জিন্নার জীবনীও তিনি লিখেছিলেন হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উন্নতিসাধনে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সরোজিনীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫) তিনি জড়িত ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কর্মরত অবস্থায় তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হন। যেমন— জিন্না, গান্ধী ও নেহরু। ১৯১৫- ১৯১৮ সালের মধ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমাজকল্যাণ, নারীজাগরণ, জাতীয়তাবাদ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নেহরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের শিকার চম্পারণ অঞ্চলের নীল চাষীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। সরোজিনী মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন। সেই বছরই তিনি ‘হোমরুল লিগ’-এর দূত হিসেবে ইংল্যান্ডে যান।

এইভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মপন্থার সঙ্গে সরোজিনী সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনিও প্রায় দু’ বছর কারাবরণ করেন। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালের ২ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোকগমন করেন। ▮

ছোটদের জন্যে, ছোটোদের নিয়ে

ছোটোদের অভিনয়ে ঘ্যাঁঘাসুর

কৌশিক গুহ

ঘ্যাঁঘাসুর গল্পটা অনেকেবার পড়েছে স্বর্ণাভ। সেই প্রস্তাবটা রেখেছিল নাটকের শঙ্করীপ্রসাদ স্যারের কাছে, 'এবারে ওই গল্পটা নিয়ে নাটক করা যেতে পারে?' গল্পের মধ্যে মজা ঠাসা। যতবারই পড়া যাক নতুন লাগে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা স্বর্ণাভ বার বার পড়েছে। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করেছে বাড়ির সকলেরই ভালো লাগে। গল্পকে টেনে বাড়াতে না পারলে নাটক হয়ে উঠবে না। নাটকের আরেক স্যার অয়নাংশু চট্টোপাধ্যায়। তিনি শুনে

একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোরা কি করে ভাবলি বলতো? আমি তো এবারে অনুষ্ঠানের জন্যে ওই গল্পটার নাট্যরূপ দিয়ে ফেলেছি।' ছেলেরা একসঙ্গে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। নাচের দিদিমণি প্রিয়াঙ্কা ঘোষ বড় বেশি কড়াকড়ি পছন্দ করেন। তিনি ছুটে এসে বললেন, 'এত হইচই কেন?' স্বর্ণাভ বলতে যাচ্ছিল, 'এটা কি জেলখানা যে সবসময় চুপচাপ থাকতে হবে! আমরা তো রামগরুড়ের ছানা নই। আমাদের আনন্দে হাসতে মানা নেই। কিন্তু—' ভাবনাটা শেষ করার আগেই অয়নাংশু-স্যার বললেন, 'যাক তোরা একটু আস্তে কথা বল। বেশি জোরে কথা বললে হাসলে নাচের তাল কেটে যেতে পারে।' প্রিয়াঙ্কা কিছু না বলে নিজের ক্লাসে মন দিলেন। অয়নাংশু-স্যার বললেন, 'শোন অনেকে যাতে নাটকে অংশ নিতে পারে সেজন্যে কয়েকটা চরিত্র বাড়িয়ে দেবো। পরের শনিবার থেকে পুরো রিহার্সাল শুরু হয়ে যাবে।'

স্বর্ণাভ গল্পটা অল্প কথায় সকলকে বলে দিল। অনেকেই বলল বাড়িতে ফিরে পড়ে নেবে। পড়া থাকলে বুঝতে সুবিধে হয়। অয়নাংশু- স্যার শনিবার খাতা দেখে পুরো নাটকটা পড়লেন। স্বর্ণাভ লক্ষ্য করল গল্পের সব কিছু বজায় রেখে চমৎকার ভাবে সাজানো। নাটক করার সময় মজা মিলবে। পড়ার সময়েও ভালো লাগবে। আগাগোড়া টানটান। মন দিয়ে শুনল সবাই। নাটকের বড় স্যার শঙ্করীপ্রসাদ মিত্র ঠিক করলেন কাকে কোন চরিত্র দেওয়া যায়। নাটক লেখা খাতাটা চাইলেন ছোটোদের সংস্থার সেক্রেটারি বাসুদেব গুপ্ত। তিনি কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন খেয়াল করেননি অয়নাংশু। এক মনে পড়ছিলেন নাটক। বাসুদেব একজনকে পাঠালেন নাটকের খাতাটা দিয়ে ফোটোকপি করবার জন্যে। পাঁচটা কপি করিয়ে আনতে বললেন।

নাটকের সঙ্গে ভাবনা চলল শব্দ আলোর। মঞ্চে অভিনয়ের সময় একটুও ফাঁক থাকলে চলবে না। যারা অংশ নেবে তাদের প্রত্যেককে নিজের নিজের অভিনয়ের অংশ মুখস্থ করতে হবে। গল্পটা ঠিকমতো বুঝলে নাটকের মধ্যে ঢোকা সহজ। কয়েকদিন রিহার্সালের পর মনে হলো অয়নাংশুর হয়তো দাঁড়িয়ে যাবে। লোকে নেবে। নাটকের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই চাপ বাড়তে থাকল। কড়া দিদিমণি প্রিয়াঙ্কা ঘোষ বললেন, 'নাটক এবার বেশ জমে যাবে মনে হচ্ছে।' ছেলের দল চেঁচাল না ওইরকম কথা শুনে। কারণ তারা নাটক নিয়ে মেতে গেছে। কারও কথা না শুনে তারা একমনে রিহার্সাল করছে।

প্রতিবারের মতো এবারেও মাতিয়ে দিলো ছোটোরা। তাদের নিয়ে কাজের সময় চারপাশে লক্ষ্য রাখতে হয়। কখন কি যে ঘটাবে। একটু- আধটু বকুনি নাটকের স্যাররা দিলেও পরক্ষণে আদর করে বলেন, 'ঠিক ভাবে তৈরি থাক।' দেবাশিস ভট্টাচার্য যত্ন করে সাজিয়ে দিলেন প্রত্যেককে। অয়নাংশু-স্যার লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন আগে। আলোর ব্যবস্থা ঠিক মতো আছে দেখে নিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। সেইসঙ্গে শব্দের ব্যাপারটাও। মঞ্চ সাজিয়ে দিলেন চটপট চন্দন-স্যার।

জমে গেল নাটক। অভিনয়ের পরে স্বস্তি পেলেন শঙ্করীপ্রসাদ এবং অয়নাংশু। বাসুদেব এগিয়ে এসে বললেন, 'চমৎকার হয়েছে।' তিনি খুশি হওয়া মানেই প্রত্যেকে চকোলেট পাবে। স্বর্ণাভ হাত বাড়াল আগে। তার অভিনয় খুব ভালো হয়েছে। গম্ভীর প্রিয়াঙ্কা বললেন, 'বেশ হয়েছে।' বাসুদেব বললেন, 'তুমি ছোটোদের হইচই তো পছন্দ করো না। নাও চকোলেট একটা খাও।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

চলার পথে

ঋষিক আর তার বই

আগে উল্টো করে বই পড়ত মন দিয়ে ঋষিক। ঠাকুমা জিগগেস করত একটু হেসে, 'বইটা ভালো লাগছে?' ঋষিক বলত, 'আমাকে ডিসটার্ব কোর না। এখন পড়ছি।' ঠাকুমা বলত, 'ঠিক আছে পড়ো।' একটু বাদেই বই রেখে ঋষিক চলে আসত ঠাকুমার কাছে। গলা জড়িয়ে বলত, 'একটা গল্প বলো।' গল্পের ভাঁড়ার ভালোভাবে মজুত রাখতে হোত। গল্প শোনা চাই। নাতিকে দেখে ঠাকুমার মনে পড়ে যেত নিজের ছেলেবেলার কথা। ঋষিকের দাদু ব্যস্ত মানুষ। গল্পটল্প বলতে পারে না। ঋষিক বলে, 'তুমি ঠাকুমার কাছে শুনে শুনে গল্প শিখতে পারো না?' দাদুর জবাব ছিল, 'ঋষিকবাবু গল্প বলো, আমি শুনি।' ঋষিক অনেক গল্প বলত। মন দিয়ে গম্ভীর হয়ে শুনতে হোত দাদুকে। এখন আর গল্প শুনতে হয় না সে নিজে পড়তে পারে। বইয়ের জোগান ভালোমতোন রয়েছে। কদিন আগে পিসি এসেছিল, কত বই এনেছিল। ঝকঝকে ছাপা ছোটদের বই। এখন নিজে নিজে পড়ে মজা পায়। ঠাকুমার ছোটভাইকে ঋষিক বলে মামা-দাদু। তার বাবা আর পিসি ডাকে মামা। পিসি বিদেশে থাকে। যখনই আসে একগাদা বই আনে। সুন্দর সুন্দর ছবি আছে তাতে। মামা-দাদুও বই আনে। তার বাবা আর পিসি যখন ছোট ছিল কত বই দিয়েছে মামা-দাদু। সব যত্নে রয়েছে। ঋষিকদের বাড়িতে অনেক বই। তার মা মাঝে মাঝেই বই গুছিয়ে রাখে। দাদু বলে, 'বইকে ভালোবাসলে সেও তোমাকে ভালোবাসবে। খুব ভালো বন্ধু বই।' বইয়ের মধ্যে যে কত মজা লুকনো আছে সেটা এখন একটু আধটু বুঝতে পারে ঋষিক। নতুন বই পেলে খুব আনন্দ হয় তার।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নামে দুজন রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন। দুজনের পরিচয় কি?

২. সাহিত্যিক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়-এর মাতামহ কে? বাবা?

৩. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কোন্ পৌত্র লেখক, চলচ্চিত্র পরিচালক?

৪. ঘনাদা, টেনিদা, ব্রজদার স্রষ্টা কোন্ কোন্ সাহিত্যিক?

৫. ছোটদের এক প্রিয় চিত্রকর সত্তর বছর ধরে ছবি এঁকে চলেছেন? এখন তাঁর বয়েস কত?

উত্তর : ১. প্রথম প্রভাতকুমার : ছোটগল্পকার, সাহিত্যিক। দ্বিতীয় প্রভাতকুমার : গ্রন্থাগারিক, রবীন্দ্রজীবনীকার। ২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. সত্যজিৎ রায়। ৪. প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ। ৫. নারায়ণ দেবনাথ। কিছুদিন আগে নব্বই ছুঁলেন।

ফিরে পড়া

সার্থক জনম আমার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।।
জানিনে তোর ধন-রতন আছে কিনা রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।।
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।।

নারীশক্তির বিকাশ ভাবনা

সুতপা বসাক ভড়

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্ত রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া।।
—মনু

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের, সে দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই।

নারী শক্তির বিকাশের প্রসঙ্গ এলে সাধারণত সমাজে নারীর সামগ্রিক উন্নতিসাধন বুঝি। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও এতে সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। নারী সশক্তিকরণের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সমাজ তথা দেশের পূর্ণ বিকাশ জড়িত। স্বশিক্ষিত সমাজ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, গরিবি উৎসারণ আর সুস্থ সমাজের জন্য চাই নারী সশক্তিকরণ। একজন সুশিক্ষিত সশক্ত নারীই কেবলমাত্র পারে উপরিউক্ত সমস্যার সমাধানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে যদি দেখা যায়, তাহলে প্রাচীনকালে সমাজে নারীর স্থান পুরুষের সমান ছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও নারী তার শিক্ষা, সংস্কার, কাজ দিয়ে নিজেদের প্রমাণ করেছে বার বার। লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, বাচক্লবী, খনা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী--- এইসব প্রাতঃস্মরণীয় নারীরা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতে নারীকে স্বমহিমায় বিরাজ করতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে বিদেশি অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নারী অবগুণ্ঠিত হয়ে পর্দানসীন হয়ে পড়ে। শত্রুর কু-দৃষ্টি ও অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার্থে তাঁরা গৃহেই কেন্দ্রিত হয়েছেন। পরে এর সঙ্গে যোগ দেয় রক্ষণশীল, গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজ— যারা নারীর শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার সবেতেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়। ফলস্বরূপ ভারতীয় নারী মানসিকভাবে পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভর হয়ে যায়। দুর্বল মাতৃত্ব কখনও সবল সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসত্বের একটা দীর্ঘমেয়াদি পর্ব শুরু হয়ে যায়। কিন্তু 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'। হিন্দু সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য— এঁদের আবির্ভাব এবং নিরলস প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান পুনরায়

উজ্জীবিত হতে শুরু করে। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে, তবে এর গতি আশানুরূপ নয়, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মনুষ্য সমাজের বিকাশে এবং উন্নতিকল্পে নারী-পুরুষের সমানতা আবশ্যক ছিল, আছে এবং থাকবে। বাস্তবে দেখা যায় যে, কোনো সমাজে নারীর স্থান, রোজগার ও জীবনশৈলীই সম্পূর্ণ সমাজ এবং দেশের সমগ্র বিকাশের মাপকাঠি হয়। রাষ্ট্রে পূর্ণাঙ্গ বিকাশে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া যে কোনো রাষ্ট্রে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীতে নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় সমান। অথচ মোট কাজের তিন ভাগের দু'ভাগ মেয়েরাই করে। বিশ্বের মোট উপার্জনের এক তৃতীয়াংশ মেয়েদের দ্বারা উপার্জিত, কিন্তু তারা মোট সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধার দশভাগের মাত্র একভাগই ভোগ করতে পারে। ভারতে মেয়েদের আর্থিক অবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই খারাপ। কার্যরত মহিলাদের সংখ্যা আমাদের দেশে ব্রাজিল, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়ার থেকেও কম। ১৯৭০-'৭১-এ কার্যরত মহিলার হার ছিল ১৪.২ শতাংশ, পরে তা বেড়ে ২০১০-১১-তে ৩১.৬ শতাংশ হয়েছে, এটা কিন্তু যথেষ্ট নয়। কার্যরত মহিলাদের হার আমেরিকাতে ৪৫ শতাংশ, বৃটেনে ৪৩ শতাংশ, কানাডাতে ৪২ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়াতে ৪০ শতাংশ এবং ব্রাজিলে ৩৫ শতাংশ। ভারতবর্ষে সফল মহিলাদের সংখ্যাও বড় কম নয়— সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে সুষমা স্বরাজ, চন্দ্রা কোচর, ইন্দিরা লুই, কিরণ মজুমদার শ, সোনাল মান সিং, গিরিজা দেবী, সানিয়া মির্জা, সাইনা নেহওয়াল, মেরী কম। এঁদের অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে দেশের আপামর স্ত্রী শক্তির অনেকেই অশিক্ষার কারণে তাঁদের কর্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারেননি।

নারী সশক্তিকরণ একটি বহুমুখী পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে নারীসমাজকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে তারা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের ভেতরের শক্তিকে চিনতে পারে, জানতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন তাদের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কার দেওয়া হবে। তাদের জীবনের সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব তাদের ওপরেই ছেড়ে দিতে হবে, তবেই তারা আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। নারী সশক্তিকরণ করতে চাইলে নারীকে শিক্ষা দিয়ে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, পরিবার এবং সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা, মান-সম্মান দিতে হবে। আমাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষপ্রধান, সেখানে অনেকক্ষেত্রেই মহিলাদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। আমাদের মনে রাখতে হবে, সমাজের উন্নতিকল্পে মহিলাদের যোগদান অপরিমেয়। সেজন্য তাদের সুশিক্ষা, সুসংস্কার দেওয়া খুবই জরুরি। এই পরিকল্পনা সময় সাপেক্ষ, সেজন্য মহিলাদের সবল করে তুলতে হলে আইন প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, পারিবারিক স্বাস্থ্য, সন্তানের লালন-পালন এবং তাদের সুসংস্কার দেবার মতো গুরুদায়িত্ব কেবলমাত্র নারীই নিতে পারে। সুতরাং নারী শক্তির সর্বাত্মক বিকাশ যোজনা একটি অতি আবশ্যক যোজনা। ■

ইসলামি আতঙ্কের মূল

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

ফরিদ জাকারিয়া নিজের নামের জন্য লালায়িত নন। তিনি সি এন এন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত প্রখ্যাত বিশ্লেষক ও নির্ভীক সাংবাদিক। তাঁর মতে বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক অস্থিরতা মুসলমান দেশগুলিতেই চলছে। যে দেশগুলি এই রোগের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে ছিল, তারাও বর্তমানে এই রোগের শিকার হয়ে গিয়েছে। ইসলামিক বিশ্বের প্রতিটি দেশ কোনো না কোনো রাজনৈতিক রোগে আক্রান্ত। গতকাল পর্যন্ত যারা শান্তিতে ছিল, তারাও আজ এদের থাবার মধ্যে এসে গিয়েছে। নির্ভীক সাংবাদিক ফরিদ জাকারিয়া এবিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করার জন্য এমন কতকগুলি মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করে মুসলমানদের পিছনের দিকে যাওয়া এবং কোনো না কোনো হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর বক্তব্য, এর প্রধান কারণ হলো মুসলমানদের অন্য মত-পথের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার প্রবণতা। কি কি উপায়ে ধর্মান্তরিত করা হয়—জাকারিয়া সাহেব এই বিতর্কের মধ্যে পড়তে চান না, কিন্তু একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো নানা তথ্য উপস্থাপন করে তিনি লিখেছেন যে, জিহাদি প্রবৃত্তি ও পাগলামি সেই লোকেদের বেশি থাকে যারা নতুন মুসলমান

হয়েছে। এজন্য ধর্মান্তকরণ যদি পৃথিবীতে বন্ধ করা যায় তাহলে মুসলমান সমাজের সন্ত্রাসবাদী প্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তিনি আরও কিছু মজবুত প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস, ইসলামে এরকম কোনো ভাবনাই নেই যে, যে কোনো সাধনপথে ঈশ্বরের আরাধনা করা যায়।

তিনি লিখেছেন, যখন খবর পাওয়া গেল যে, কানাডায় রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ স্মারকের সামনে একজন কানাডারই সৈনিককে এক ব্যক্তি গুলি করে হত্যা করেছে, তখন অধিকাংশ মানুষ ভেবেছিল যে গুলি চালানো ব্যক্তি নিশ্চয় মুসলমান । পরে জানা যায়, সত্যিই সেই ব্যক্তি কট্টরপন্থী মুসলমান। এরকম ঘটনা কুয়েবেক-এও ঘটেছিল। জাকরিয়া এরকম আর একটি ঘটনার বিষয়ে লিখেছেন যা নিউইয়র্কের ক্যুইন্স-এ ঘটেছিল। চারজন পুলিশ অফিসারের হত্যাকারী জেলর থমসনও মজহবি ভাবনায় অত্যন্ত কট্টরপন্থী ছিল। জাকারিয়ার মতে, সমস্যার মূল তাদের ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে। মানবতাবাদী অথচ মুসলমানদের পক্ষপাতী বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য হলো, পশ্চিমি জগতের অহেতুক অভিযোগের জন্যই মুসলমানরা উত্তেজিত হয়। তাদের সমাজ ও মজহবের বিষয়ে কথা তারা পছন্দ করে না। অপছন্দের কথা শুনলেই তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। তাই পাগলামির জন্য তাঁরা মুসলমানদের দায়ী করেন না। তাঁদের ব্যাখ্যা হলো, পশ্চিমি দুনিয়ার আচার আচরণের কারণেই মুসলমানরা হিংসার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তাঁদের মতে, পশ্চিমের হিংসাত্মক ভাবনাচিন্তার কারণেই মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, যার ফলে কারো কারো মৃত্যুও ঘটে। প্রতিশোধস্পৃহার জন্যই এরকম হয়ে থাকে। জাকারিয়া লিখেছেন, কিছু লোকের মতে পশ্চিমি দুনিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র রচনা করে তাদের অপমান করে, এজন্য মুসলমানদের প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনা উৎপন্ন হয়।

জাকারিয়ার বক্তব্য, এই ঘটনার বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। উক্ত তিন ঘাতকের মধ্যে একজনও জন্ম থেকে মুসলমান ছিল না। নিউইয়র্ক টাইমস্-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে জেহফ বিবেয়ু'র পূর্ব জীবনের খোঁজ নেওয়া হলে জানা যাবে তার যখন ১৬ বছর বয়স তখন বিভিন্ন পার্টিতে আনন্দফুর্তি করে বেড়াত। লোকের ক্রেডিটকার্ড চুরি করা, মাদক চোরাচালান ইত্যাদির অপরাধে অনেকবার জেল খেটেছে। প্রথমে চুরির অপরাধে দু' বছর জেল খাটে। টাইমস্ লিখেছে, জেহফ কিছুদিন আগেই মুসলমান হয়েছে। জিহাদি হয়ে ইসলামের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষায় বুঁদ হয়ে থাকতো। সে সিরিয়ায় গিয়ে জিহাদের ট্রেনিং নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পরে সে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য ওটাওয়ার একজন সৈনিককে হত্যা করে পালিয়ে আসে।

এরকম কানাডায় একজন সৈনিককে পায়ে দলে মেরে ফেলা ব্যক্তিও মানসিক রোগী (ইসলামের জন্য) ছিল। সে মাত্র দু'বছর আগে মুসলমান হয়। নিউইয়র্ক

পুলিশ-দপ্তরের বক্তব্য, তাদের অফিসারের ওপর হামলাকারী ব্যক্তি আগেই মুসলমান হয়েছিল। বর্তমানে আই এস আই এস-এর রবরবার বাজারে তার চরিত্র দেখে জেহাদিরা তাকে এই প্রকার কুকৃত্য করার প্রেরণা দিয়েছে। সে এরকম যুবক ছিল যার মধ্যে হিংসা ও কট্টরতার তুফান বইতো। বাস্তবে সে এরকম কিছু একটার সন্ধানেই ছিল। পরিবেশ পেয়ে তাতেই স্বপ্নপূরণের জন্য লেগে পড়ে। কেননা তাকে শেখানো হয়েছিল জিহাদের মধ্যেই সে সবকিছু পেয়ে যাবে। এরকম পাগল লোকের সংখ্যা খুব কম, অন্যথায় ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া এবং আলকায়দার মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি গত দশ বছর ধরে পশ্চিমি দেশগুলির অনেক শহর জঙ্গি গতিবিধি চালিয়ে শেষ করে দিতে পারতো। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে খুবই কম লোককে তারা নিজের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছে। যদি সব মুসলমান কট্টরপন্থী হয়ে যেত তবে বিগত ঘটনায় তিন জন নয় বহু মুসলমানকে সামিল করতে পারতো। তারা এজন্য এরকম করতে পারেনি, কারণ সন্ত্রাসবাদী তৈরি হওয়া ও সন্ত্রাসী কাজকর্ম করাটা তারা ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছে। এটা তাদের তৈরি করা প্রবৃত্তি। মুসলমানদের আপনভাবা বুদ্ধিজীবীরা যদি বিশ্লেষণ করেন দেখবেন এই সমস্যা ইসলামের ভিতরের জিনিস।

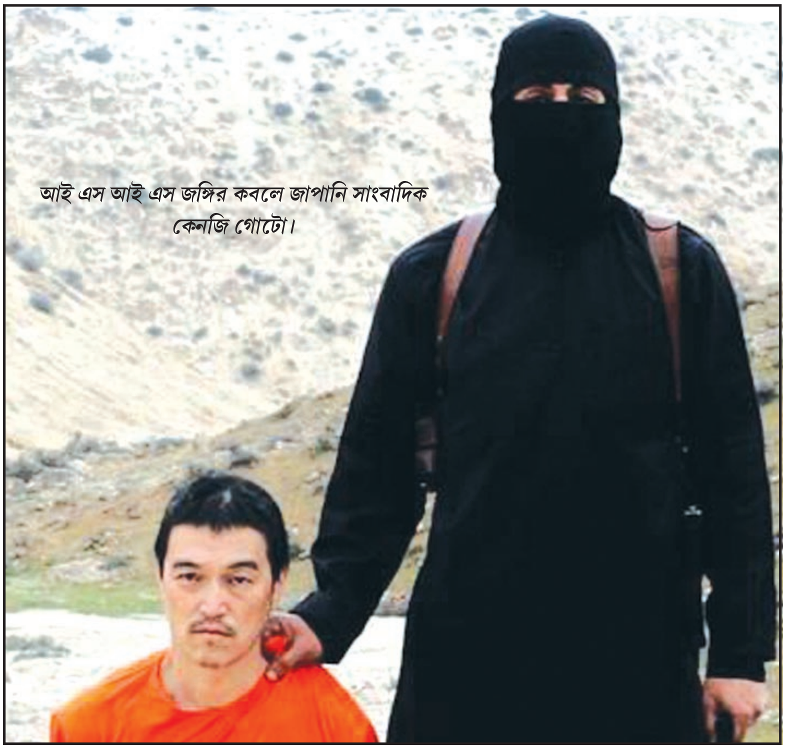

আই এস আই এস জঙ্গির কবলে জাপানি সাংবাদিক কেনজি গোটো।

ইসলাম রক্ষার জন্য কেউ কেউ তর্ক করেন যে, এরকম যারা করছে তারা ইসলামের প্রতিনিধি নয়। একথা একটা সীমা পর্যন্ত ঠিক হতে পারে, কিন্তু এরকম বীভৎস কর্ম বন্ধ করার জন্য মুসলমানরা কিছুই করেনি এবং এরকম করার কোনো ইচ্ছাই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। মুসলমানদের প্রমাণ করতে হবে যে, তারা সন্ত্রাসবাদ ও অসহিষ্ণুতা সমর্থন করে না। তাদের জবাবদিহি করতে হবে যে, নরসংহার থামানোর জন্য তারা এখন পর্যন্ত কি করেছে? তাদের অভিযোগ, তাদের বদনাম করার জন্য বিশ্বের একটা লবি কাজ করছে। তাদের আরো বলতে হবে যে, কেন তারা এরকম কাজের নিন্দা করে না এবং বন্ধ করা আবশ্যক এটাও বোঝে না। কিন্তু যারা বন্ধ করা বা নিন্দা করার কাজ করছে তাদের মুখ আটকানো হচ্ছে কেন? মুসলমানরা যদি শান্তিতে থাকতে চায় তবে তারা অন্যকে শান্তিতে থাকতে দিতে হবে। এরকম না করতে পারলে সারা দুনিয়া তাদের বিপক্ষে যাবে। এজন্য সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য। তাহলেই তারা অন্যের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা করতে পারবে।

ভারতের মুসলমানরা যদি এখন আগ্রায় পরাবর্তনের ঘটনা এই আয়নায় দেখে তবে তারা বুঝতে পারবে যে, যা কিছু হয়েছে তার জন্য তারাই দায়ী। এদেশের অগণিত মানুষকে মনের সুখে নিজেদের মজহবে তারা নিয়ে গিয়েছে। তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মগুরুদের নিন্দা করেছে। তাদের সমাজরক্ষকদের কাপুরুষ ভেবে হাসি-তামাশা করেছে, তখন কোনোরকম চিন্তা হয়নি। আজ যখন তাদের সমাজ শক্তিশালী হয়ে তাদের হারানো ভাইদের নিজের ঘরে ডেকে নিচ্ছে তখন চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? এখানে কারো বিশ্বাসকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়াটা অধিকার মনে করা হয়েছে। সেটাই অন্যেরা করলেই আঙুল ওঠানো হচ্ছে কেন? ভারতের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে ধর্মান্তরিত করা আজকের খেলা নয়, অনেক বছর থেকে চলে আসছে। মানুষের বিশ্বাস বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ভূগোল বদলে ফেলার চক্রান্ত বহু বছর ধরে চলছে। ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে আইন আছে এদেশে। কিন্তু এই আইনের ফাঁকে এই খারাপ কাজ করার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী আইন নেই। আজ যারা চিৎকার করছে তারা ধর্মান্তকরণ বন্ধ হওয়ার জন্য আইন আনার সাহস দেখাতে পারছে না। যারা চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে তারা ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে আইন আনতে পারছে না। সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, আস্থা কিনে নেওয়া ও বিশ্বাস বদলে ফেলা যদি পাপ হয় তাহলে আগে যারা এই কাজ করেছে তারাও পাপ করেছে। ফরিদ জাকারিয়ার মতে, ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে যদি আইন আনা না যায় তাহলে আগরার মতো ঘটনার কোনো সমাধান হবে না। ▌

ওবামার ভারত সফর ও আমাদের প্রাপ্তি

দেবব্রত ঘোষ

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ৩ দিনের জন্য ভারত সফরে এসে ঘুরে গেলেন। এর আগেও আরো অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারত সফরে এসেছিলেন। কিন্তু এবারের সফর অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ প্রথাগত রাজনৈতিক সম্পর্ককে অতিক্রম করে ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্র মোদী এবং ওবামা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলেন এবং এই সফরটাকে তাঁরা দু'জনেই পুরোপুরি ব্যবসায়িক বা সামরিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সম্ভাবনাকেও বাস্তবায়িত করেছেন। ভারতের সমস্যা ও সঙ্কটকে ওবামা যে অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছেন এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সক্রিয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তান ও চীনের তোয়াক্কা না করেই— সেটাই ওবামার ভারত সফরকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে যা নেহরু-ইন্দিরা-নরসিংহ-ভিপি সিং- মনমোহন জমানাতে হয়নি। ভারতের অর্থনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অগ্রগতির জন্য ও সন্ত্রাস দমনে ওবামা আন্তরিক তা এবারের সফর প্রমাণ করেছে। কৃতিত্ব আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর।

ক্রমশ বেড়ে চলা হিংসাত্মক মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যৌথ মোকাবিলা ও সক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাপারে আমেরিকা ভারতকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে বলে ভারত সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটাই ২০১৫ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অন্যতম প্রধান সাফল্য যা আগেকার কংগ্রেসী জমানায় করা সম্ভব হয়নি কিছুটা মনমোহন সিং সরকারের দীর্ঘসূত্র মনোভাব ও দূরদর্শিতার অভাব এবং কিছুটা আমাদের দেশের বামপন্থী দলগুলোর অত্যধিক চীন প্রীতির জন্য। যাদের চটিয়ে কিছু করা মনমোহন সিং নিয়ন্ত্রিত ইউপিএ সরকারের সাহসে কুলোয়নি। তিনদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকতে গেলে এবং ভারতবাসীকে জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে চীন ও পাকিস্তানের মোকাবিলা করতে হবেই এবং সেই ক্ষেত্রে এই চুক্তিটা অবশ্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল যা এবারকার ভারত সফরে বারাক ওবামা করে দেখালেন। এর সামগ্রিক কৃতিত্ব অবশ্যই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রাপ্য।

অসামরিক পরমাণু চুক্তি ক্ষেত্রে মার্কিন সহযোগিতা : ওবামার ভারত সফরের দ্বিতীয় সদর্থক দিক হলো অসামরিক পরমাণু চুক্তি ক্ষেত্রে মার্কিন সহযোগিতা। আমাদের দেশে কোনো কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট থাকলেও কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে কিছু খনিজ দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে নেই বা অতি দ্রুত কমে আসছে। আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ ছাড়া ছোট-মাঝারি-বড় কোনো শিল্প গড়ে তোলাই সম্ভবপর নয় এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রথম ও প্রধান শর্ত। অথচ শুধুমাত্র জলবিদ্যুৎ বা সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো একান্তই অসম্ভব। তাপবিদ্যুৎ তৈরির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক কাঁচামাল কয়লা বিশেষ করে উন্নতমানের খনিজ কয়লার পরিমাণ কমে আসছে বলে বিকল্প বিদ্যুৎ তৈরির কথা আমাদের ভাবতেই হবে। পরিবেশ দূষণ সব বিদ্যুৎ কেন্দ্রেই কমবেশি হয়ে থাকে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরি এখন আধুনিক পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বিকল্প যা ইউরোপের অনেক দেশ গ্রহণ করেছে এবং আমাদের দেশেও আগামী ভবিষ্যতে গ্রহণ করতে হবে। পরমাণু বিদ্যুৎ নির্মাণে যে পরিবেশ দূষণ হয় বা মানুষ-সহ অন্যান্য প্রাণীর যে শারীরিক ক্ষতি হয় বা প্রাকৃতিক

ভারসাম্য নষ্ট হয় তা দূরীকরণের জন্য স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক সমাধানও রয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব এবং সেটা গ্রহণ করাও হবে।

পরমাণু বিদ্যুৎ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (ইউরেনিয়াম ইত্যাদি) অনেকটাই আমেরিকা সরবরাহ করবে আর পরমাণু বিদ্যুৎ নির্মাণকেন্দ্র তৈরি ও সরবরাহের আধুনিক টেকনোলজি আমাদের দেশেই রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তাঁর সঙ্গে সফররত স্পেশাল টিম আমাদের দেশের সঙ্গে এই ব্যাপারে যে সরকারি চুক্তি করেছেন দিনের আলোয় (যা প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষিত হয়েছে কোনো লুকোচুরি বা গোপনীয়তা ছাড়াই) তা এক সার্থক পদক্ষেপ আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে স্থায়ী সদস্যপদ দেবার ব্যাপারে ওবামার ভূমিকা : রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে স্থায়ী সদস্যপদ দেবার ব্যাপারে বারাক ওবামা এক সক্রিয় ও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে। এই ব্যাপারটায় চীনের ও পাকিস্তানের আপত্তি ছিল। ওবামা এই পাক-চীন আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর দিকে বন্ধুর মতো উষ্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতকে রাষ্ট্রপুঞ্জে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা পাকিস্তানের দোসর চীনের আর থাকবে না এটাই ওবামার ভারত সফরের আরেকটা সদর্থক দিক।

আধুনিক সমরাস্ত্র পরিবহণ ও যুদ্ধ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মার্কিন সহযোগিতার সুনিশ্চিতকরণ : Unmanned Aerial Vehicle এমন একটি আধুনিক বিমান যা দিয়ে বহু দূরবর্তী দুর্গম এলাকায় নজরদারি চালানো যায় যেটা হেলিকপ্টার দিয়ে সম্ভবপর নয়। এটি আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা দু'টো বিভাগের জন্যই অত্যাবশ্যক যা দিয়ে লুকিয়ে থাকা শত্রুপক্ষের ওপর নজরদারি চালানো যায় এবং যুদ্ধকালীন শত্রুপক্ষের সঠিক অবস্থান বোঝা যায়। C-130 বিমান হচ্ছে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র পরিবহণকারী বিমান। বারাক ওবামার এবারকার ভারত সফরে যে চুক্তি হয়েছে তার মাধ্যমে এই দুই সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র ভারতের আওতায় চলে আসবে। শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের দেশে এইগুলি তৈরি করে বিদেশে বিক্রি করে যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা উপার্জন করতেও সক্ষম হবে। যদি আমাদের দেশ কখনো বিদেশি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় যারা আমাদের দেশের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে চায়, তার উপযুক্ত মোকাবিলা করার উপযোগী বিশেষ ধরনের পোশাকও আমরা আমাদের সৈন্যদেরকে সরবরাহ করতে সক্ষম হবো। আমেরিকা এই

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12

71, Park Street, Kolkata - 700 016

98311 85740, 98312 72657

Visit Our Website :

www.calcuttawaterproofing.com

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ব্যাপারেও আমাদের উপযুক্ত কাঁচামাল এবং নির্মাণ প্রযুক্তি সরবরাহ করবে বলে প্রতিশ্রুত। যুদ্ধবিমান বহনকারী আধুনিক জাহাজ নির্মাণেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সহায়তা করবে। এছাড়া Defence Trade & Technology Initiative-এর মাধ্যমে আজকের ভারত আমেরিকা ও ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলোর সমকক্ষ হতে পারবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনায় ভারতের কোনো বাধা থাকবে না : সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সবচাইতে বেশি পরিমাণে অস্ত্র কেনে (আসলে আমাদের দেশ অস্ত্র কিনতে বাধ্য হয় তার প্রতিবেশী দুই দেশের আগ্রাসী অনৈতিকতার জন্য)। আমেরিকা সারা পৃথিবীতে বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী এবং ইতিহাস প্রমাণ করেছে রাশিয়ায় নির্মিত ও রাশিয়া কর্তৃক সরবরাহ করা অস্ত্রসমূহের চাইতে আমেরিকার অস্ত্রসম্ভার অনেক বেশি উন্নতমানের। ওবামার ভারত সফরের পরে ভারতের পক্ষে আমেরিকা থেকে উন্নতমানের অস্ত্রসম্ভার কিনতে আর বাধা থাকবে না। উন্নতমানের আধুনিক অস্ত্রসম্ভার ও বিমানবাহিনী ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রই টিকে থাকতে পারে না। সেটা আছে বলেই একটা অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ইজরায়েল এতগুলো জঙ্গিবাদী ইসলামিক রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত ও আক্রান্ত হয়েও সসম্মানে টিকে রয়েছে। অবশ্য তাদের প্রবল জাতীয় ঐক্যবোধও একটা কারণ।

পশ্চিমবাংলার জেলায় তালিবানের উত্থান ও সন্ত্রাসবাদ রুখতে মার্কিন সাহায্য কাজে লাগবে : আল কায়দার আল জেহাদ নামে একটা নতুন মুসলমান জঙ্গি সংগঠন পশ্চিমবাংলায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির সন্ত্রাসবাদীরা এই নতুন জঙ্গি গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় তার শাখা বিস্তার করছে বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়ায়। এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আহলে হাদিস ও হিজাফত-ই-ইসলামের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোও। কুখ্যাত জঙ্গি মাসুদ আজহার এদের অন্যতম মাথা। আমাদের রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে আছে। রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলা মুর্শিদাবাদ মুসলমান অধ্যুষিত। যেখানে অনুপ্রবেশজনিত কারণে হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে এবং দ্রুতগতিতে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেআইনি মাদ্রাসা। তালিবানি শাসন চলছে মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রামে। সরস্বতী পুজো-সহ অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর পুজো বন্ধ করতে হবে, মন্দিরে অনুষ্ঠান করা যাবে না, বাড়িতে আলপনা দেওয়া চলবে না এমন তালিবানি ফতোয়া দেওয়া চালু হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রামে। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছেন রমাপ্রসাদ সরকার এবং তিনিও হুমকির মুখে পড়েছেন। আমাদের রাজ্যের সংখ্যালঘু তোষণকারী সরকার তথা প্রশাসন তথা একচ্ছত্র সর্বাধিনায়িকা মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার। বিপন্ন পশ্চিমবাংলা ও বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ, সি আই ডি ও প্রশাসনের ওপর ভরসা করলে বেঁচে থাকার কোন উপায় থাকবে না। তাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক দৌলতে মার্কিন সহযোগিতায় যদি ইসলামি উগ্রবাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হয় তবে সেটাই বাংলা ও বাঙালির কাছে বরণীয়।

নরেন্দ্র মোদী ও স্বচ্ছভারত : প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই স্বচ্ছভারত পরিকল্পনার ব্যাপারটা অভিনব এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যা তাকে মোদীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করেছে। আমাদের দেশে কংগ্রেস, লালু-মুলায়ম-মায়াবতী-জয়ললিতা-নীতিশ কুমার-সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস সকলেই মৌলবাদকে কোনো না কোনো ভাবে লালন-পালন অথবা প্রশ্রয় দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে যেটা ইসলামি মৌলবাদকে পুষ্ট, বিকশিত ও প্রসারিত হতে সাহায্য করছে। প্রতিবাদ যদি কেউ করে থাকে তবে সেটা একমাত্র বিজেপি। ভাষা-বর্ণ-উপজাতি-বিশেষ জনগোষ্ঠী-ধর্ম-প্রদেশ নির্বিশেষে অখণ্ড ভারতবর্ষ যা সমস্ত ভারতীয়ের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সারা দেশে একই সিভিল কোড মেনে সমদৃষ্টিতে আইনের প্রয়োগ করবে এটাই হওয়া উচিত। যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এবং জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে বিজেপি সে পথে চলতে চাইছে। স্বচ্ছভারত গঠনের উৎস কিন্তু দেশপ্রেমসম্ভূত ভারতীয় জাতীয়তা যা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রচার করে থাকে এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ভাবিত নরেন্দ্র মোদী সেই জাতীয়তাবোধ থেকেই উন্নয়নের স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক দিয়েছেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক বিজেপি-কে আক্রমণের সময় আপাত-বিরোধী রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের প্রবক্তাদের একই মঞ্চে আমরা একত্রিত হতে দেখি। ওবামার ভারত সফরকে কেন্দ্র করেও এই দলগুলো ভেদাভেদ ভুলে একমঞ্চে সমাসীন। সন্ত্রাসবাদের জঘন্য চেহারাটা ওবামা জানেন (জানে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি সহ ইউরোপের অনেক দেশ) বলেই স্বচ্ছ ভারত পরিকল্পনার প্রবক্তা মোদীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। ■

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

স্বাগত নীতি-আয়োগ : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ অনেকটাই মিটবে

দেবাংশু ঘোড়ই

সুদীর্ঘ ৬৫ বছর পর অবসর নিল যোজনা কমিশন। যোজনা কমিশনের জায়গা নিল 'নীতি আয়োগ'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং টুইট করে নববর্ষে এই আয়োগ গঠিত হবার কথা জানিয়েছেন। কি এই নতুন নীতি আয়োগ? এই লেখার মধ্যে দিয়েই জেনে নেব তার খোল-নলচে। 'নীতি' বা 'NITI আসলে National Institution for Transforming India-র সংক্ষিপ্ত রূপ। বছরের প্রথম দিনে মানে ১ জানুয়ারি, ২০১৫ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করল এই নীতি। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও সুপারিশ করা। যেখানে যোজনা কমিশনের দায়িত্ব ছিল ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলির জন্য শুধু আর্থিক নীতি প্রণয়ন করা ও তৎসংক্রান্ত তহবিলের বরাদ্দ করা সেখানে নীতি আয়োগের কাজ হবে শুধুমাত্র নীতি প্রণয়ন ও সুপারিশ।

যোজনা কমিশনের সঙ্গে কোথায় এর পার্থক্য? নীতি আয়োগের লক্ষ্যই হলো বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নিয়মিতভাবে একটি প্রকৃত সহকারী যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও কাঠামো তৈরি করে শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলা। রাজ্যগুলি নিয়মিতভাবে তাদের বিভিন্ন রকমের বাধা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়ে পাঠাবে। উল্লেখযোগ্য, তার পাশাপাশি রাজ্যগুলি তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনানুযায়ী মোট ৪০টি কেন্দ্রীয় স্পনসর পরিকল্পনার আওতাতেও আসবে।

যোজনা কমিশনের উপর থেকে নীচে আসার পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন কাঠামোটি কাজ করবে নীচের থেকে উপরের দিকে। যেখানে যে কোনো রকমের সিদ্ধান্ত একদম তৃণমূল স্তরে নেওয়া হবে এবং সেখান থেকে পৌঁছবে উপরের দিকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্তরে। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এক সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এবং তাই

স্বাগত জানাই যেখানে একেবারে গ্রামস্তর থেকে কোনো সদর্থক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর তা সরকারের একেবারে উপর মহল পর্যন্ত পৌঁছবে। শুধু তাই নয়, নীতি আয়োগ ভারত সরকারের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবেও কাজ করবে যার সর্বোপরি কাজ হবে কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে সাহায্য করা ও তার প্রধান উপাদান হিসেবে সুকৌশল ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করা।

নীতি আয়োগের গঠনতন্ত্র: নীতি আয়োগের মধ্যে থাকবেন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী, প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রতিটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফট্যানেন্ট জেনারেল। নীতি আয়োগ গঠন-ই হয়েছে প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রতিটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফট্যানেন্ট জেনারেলের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার পর। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে বিষয়টা সেটা হলো এই আয়োগের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রতিটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফট্যানেন্ট জেনারেলের প্রতিনিধিত্ব। এই সময় পরিকল্পনাটি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই নরেন্দ্র মোদীর মাথায় প্রথম আসে এবং এই বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি নিজে স্বীকারও করেছেন যে এমন একটা কাঠামো রচনা করা দরকার যেখানে প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অংশগ্রহণ করবেন এবং তাঁদের মতামত দেবেন আর তবেই একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠিত হবে। 'নীতি আয়োগ' অবিকল তারই এক রূপ। এতদিন যোজনা কমিশনের এক নীতি সবার জন্য যেমন (একজন গ্রামের কৃষকের জন্যও যা আবার একজন সরকারি কর্মচারীর জন্যও তা এক) ছিল তা নীতি আয়োগের আসার সঙ্গে সঙ্গেই অবসর নিল। গঠনতন্ত্রটি ঠিক এইরূপ :

সভাপতি--- প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

সহ-সভাপতি--- শ্রী অরবিন্দ

পানাগড়ীয়া।

পরিচালনা পরিষদ— সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সবকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফট্যানেন্ট জেনারেল প্রমুখ।

আঞ্চলিক পরিষদ— প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে ওই একই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও লেফট্যানেন্ট জেনারেলদের নিয়ে।

সদস্যসমূহ— পূর্ণ সময়ের জন্য।

আংশিক সময়ের সদস্যসমূহ--- সর্বোপরি দু'জন তাও আবার ঘুরে ফিরে বিভিন্নরকম বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে।

পদাধিকার বলে সদস্য— সর্বোপরি চারজন এবং তাঁদের মনোনীত করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যসমূহ— বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ও অনুশীলনকারীরা।

সিইও বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা— প্রধানমন্ত্রী দ্বারা নিযুক্ত হবেন বিশেষ সময়সীমার জন্য, সচিবালয়--- প্রয়োজনানুযায়ী।

নীতি আয়োগের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব :

১। একটি শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করা যার প্রধান উদ্দেশ্য একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রীয় সরকার যা প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দ্বারা গঠিত;

২।গ্রামস্তর থেকে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত নেওয়া বা গ্রহণ করা যা ক্রমশ ধাপে ধাপে সরকারের বিভিন্ন উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া;

৩। দেশের জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলগত নীতিকে সুনিশ্চিত করা;

৪। সমাজের সেইসব স্তরের প্রতি সুনজর দেওয়া যেগুলি আর্থিক ও কৌশলগত কারণে থমকে আছে;

৫। যে কোনো ধরনের দীর্ঘস্থায়ী নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করা ও সেগুলি যাতে প্রবর্তন ও উন্নয়ন করা যায় সেদিকে সুষ্ঠুভাবে নজর দেওয়া;

৬। বিভিন্ন রকমের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলির অংশীদারীত্ব গ্রহণ করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির উপদেশের মাধ্যমে একটি সুসংহত দেশের নির্মাণ করা;

৭। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রশিক্ষক, উপদেষ্টা ও তাঁদের অংশীদারদের সঙ্গে এমন একটি ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যার ফলে বিভিন্ন ধরনের নতুন ধ্যান-ধারণা, সৃজনীমূলক ও উদ্যোগমূলক পরিকাঠামো সৃষ্টি হবে;

৮।বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ক্ষমতা নির্মাণের দিকে নজর দেওয়া;

৯। উন্নয়ন বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তঃক্ষেত্রবিশেষ ও আন্তঃবিভাগীয় বিষয়গুলির সমাধানের জন্য একটি বিশেষ প্লাটফর্মের নির্মাণ;

১০।জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়সূচি কার্যকর করার জন্য ও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন অন্যান্য অনেক কার্যক্রমের যেগুলি ইতিমধ্যে উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

যেটা বলা দরকার সেটা হলো, বিপুল সম্ভাবনা ও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজের কার্যকাল শুরু করতে চলেছে নীতি আয়োগ। স্বাভাবিক ভাবেই এই আয়োগের কাছে দেশবাসীর আশা বেশ ব্যাপক আকারের। এই উদ্যোগের জন্য যে সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন তার সাফল্যের চাবিকাঠি রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যেই নিহিত আছে। কেন্দ্র যে নীতিই গ্রহণ করুক না কেন তা তৃণমূল স্তরে বাস্তবায়িত করতে হলে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতা অপরিহার্য। কিন্তু সমস্যা হলো ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে রাজনৈতিক অবস্থাই শুধু নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থাও আলাদা আলাদা। কাজেই প্রতিটি রাজ্যের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়নের কোনো মডেলই এ দেশে সফল হতে পারে না। প্রয়োজন এমন একটা নীতি যা আঞ্চলিক অবস্থার সমস্যাগুলোকে মেটানোর জন্য যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ। কেন্দ্র সারা দেশের জন্য একটি অর্থনৈতিক নীতি নিতেই পারে কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য একে অন্যের প্রতি অটুট আস্থা রাখার দরকার এবং এমন একটা মঞ্চের প্রয়োজন যা প্রতিটি রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলবে।

ঠিক এই জায়গাতেই নীতি আয়োগের গুরুত্ব। এই সংস্থার সঙ্গে পূর্বতন যোজনা কমিশনের প্রধান পার্থক্যই হলো রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক। মাঝেমধ্যেই রাজ্যগুলি, বিশেষত বামফ্রন্ট ও তৃণমূল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে বঞ্চনার অভিযোগ তুলতেন, তার অনেকটাই নিরসন হতে পারে। নীতি আয়োগের পূর্ববর্তী সময় রাজ্যগুলির ভূমিকা জাতীয় উন্নয়ন কমিশন ও যোজনা কমিশনের বার্ষিক বৈঠকেই সীমিত থাকত। অভিজ্ঞতা বলছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ্যগুলি এই সব বৈঠকে নিজেদের বক্তব্য বা সমস্যার কথা যোজনা কমিশনের কাছে তুলে ধরত না। এবং তা না করার একটা সবথেকে বড় কারণ ছিল শেষ পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে অর্থ মঞ্জুর করার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে যোজনা কমিশনের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তাই শুধু শুধু আর্থিক সমস্যা এড়াতেই তারা তাদের আসল সমস্যার কথা বলতেন না। এইসব বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা মাথায় রেখেই নীতি আয়োগকে শুধু অর্থ মঞ্জুর করার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তাকে রাজ্যগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আদান প্রদানের ভার আরোপ করা হয়েছে। এবং সেই মতো বিনিময়ের ভিত্তিতে অর্থমন্ত্রককে নীতি নির্ধারণের আদেশ দেওয়াই হবে আয়োগের প্রধান কর্তব্য। অর্থাৎ ভারতীয় গণতন্ত্রকে একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উন্নত করতে নীতি আয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই থাকবে। যদি তা সফল হয় তাহলে দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে। কাজেই নীতি আয়োগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

(লেখক কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

Ori Plast

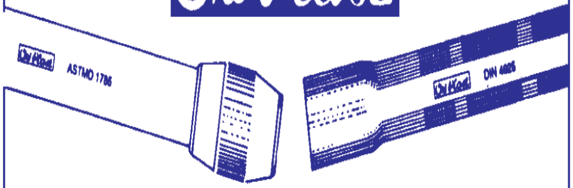

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"আমাদের ধর্ম শক্তির ধর্ম। শক্তিমান হওয়াই, আমাদের মতে, প্রথম কর্তব্য। অতএব শক্তিমান হয়ে জীবনধারণ করলে, কেবলমাত্র আমাদের উপস্থিতিই ন্যায়পরায়ণতার শক্তি বৃদ্ধি হবে, দুর্বলের রক্ষণ হবে, এভাবে জীবনধারণ করার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব কিছু কম নয়।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতীয় গণতন্ত্র

কে. এন. মণ্ডল

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর Constituent Assembly-র ৩ বৎসরের অধিককালের পরিশ্রমে নানা ধর্ম, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য মাথায় রেখে ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের নেতৃত্বে তৈরি ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হয়। সে দিনটিকে আমরা গণতন্ত্র দিবস হিসাবে জানি। ভারত ঘোষণা করে তাদের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান

“গণতন্ত্র দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত— ‘আমরা সবাই নাগরিক কতিপয় সুবিধাভোগী রাজার দেশে, আমরা যেন সবাই রাজা হতে পারি আর এতে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারেন সচেতন, আত্মমর্যাদাবান আম- আদমিরাই’।”

তারা নিজেরাই নির্বাচন করবে। Common Wealth-এর সদস্য থাকা কেবলই শিষ্টাচার।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ— দেশভাগের আগে ও পরে মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও মিঃ সুরাবর্দি খানের উসকানি ও সহযোগিতায় সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন, হাজার হাজার মা-বোন ধর্ষিতা, নিহত ও নিগৃহীত হওয়ার পরেও সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। সংবিধানের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা ও দেশভাগের মূল ভিত্তি দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করে ভারতের রাজনীতিকরা স্থাপিত করলেন ভারতের শাশ্বত তাত্ত্বিক আদর্শ ‘মিলিব-মিলাবে, একদেহে হল লীন’ তত্ত্ব। ফলে দেশভাগ ও দাঙ্গা কবলিত হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ড. আম্বেদকর-সহ আনেকের ‘লোক বিনিময়ের প্রস্তাব’ প্রত্যাখ্যাত হয় কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বারা। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আইনসভায় ঘোষণা করেন, অনেক মুসলমান ভাই জিন্নাহর প্ররোচনা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়েছেন, তাঁদেরকে আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে ঠেলে দিতে পারি না। খর্বিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বল ধর্মনিরপেক্ষতার চেহারাই এরকমই। অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে ভাবের সংঘাত। তবুও গণতান্ত্রিক ভারতের গরিষ্ঠ নাগরিক সমাজ গত ৬৫ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকেই সমৃদ্ধ করেছে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া।

আমরা আগেই বলেছি জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত ভারতবর্ষ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। নিজেরা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ঘোষণা করলেও মুসলমানদের জন্য গঠিত পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু বা শিখদের উপর সংঘঠিত নৃশংস অত্যাচার এবং তার ফলে শরণার্থীর ঢল ঠেকাতে সদ্যোজাত নতুন জাতিকে যথেষ্টই বেগ পেতে হলো। ছিন্নমূল হিন্দু-বৌদ্ধ এবং শিখদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হলো ভারতকে, কেননা এরা দেশভাগের বলি। স্বাধীনতা লাভের বিলম্বে অধৈর্য হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বকে মুসলিম লীগ ও মাউন্ট ব্যাটেনের ফাঁদে বা দিতে হলো— মেনে নিতে হয়েছে দেশভাগকে। যদিও Dominique Liperre and Larry Collins তাঁদের Freedom at Midnight বইয়ে বৃটিশ সরকারের তথ্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ‘It must be remembered that a swift transfer of power was part of

the brief Mountbatten was given by Britist Prime Minister Clement Attlee, when he was appointed Viceroy in January, 1947.' একদিকে পাকিস্তানের মূল দাবিদার জিন্নাহ্ ক্যান্সারে আক্রান্ত, অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের ছেড়ে পালনোর মনোভাব— অচিরেই ভারতকে বৃটিশমুক্ত করত।

আরও একটি বিষয় গণতন্ত্র দিবসে প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে প্রতিবেশী কিছু দেশ ভারতের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তানের আই এস আই-এর মদতে উগ্র মুসলমান মৌলবাদীদের প্রশিক্ষণ এবং ভারতে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি এবং কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার পুরনো খেলা, এই জিনিস যা ভারতকে কঠোর ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অতীতে ভারতের সিদ্ধান্তহীনতাই কাশ্মীর সমস্যার মূল কারণ এবং এর মূল হোতা মাউন্টব্যাটন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং যখন ভারতের সামরিক সাহায্য চেয়েছেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং উপজাতি সরদারদের আক্রমণ প্রতিহত করতে, তখন মাউন্টব্যাটেন কালক্ষেপ করেছেন কাশ্মীরে সেনা পাঠাতে (গভর্নর জেনারেল হিসাবে তিনিই সেনা পাঠানোর সম্মতি দেওয়ার মালিক), যতক্ষণ না মহারাজা লিখিতভাবে Instrument of accession সই করেন। মহারাজা হরি সিংয়ের চুক্তি সই করার এবং ভারতের সেনা পাঠানোর গড়িমসির মধ্যেই পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরের অনেকটা এলাকা দখল করে নেয়। মহারাজা হরি সিং-এর সম্মতিতে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি Indian Independence Acr, 1947 অনুসারেই সিদ্ধ, তা নিয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত, মাউন্টব্যাটেন মহারাজা হরি সিংকে স্বাধীনতার কয়েকদিন আগেই বলেছিলেন যে, তিনি ভারতীয় নেতৃত্বের সম্মতি নিয়েই একথা বলছেন যে, 'কাশ্মীরের পাকিস্তানেই যোগদান করা উচিত'। এই সম্মতির পিছনে নেহরু-এডুউইনার সম্পর্কের ছায়া ছিল না তো? অপর পক্ষে চীনের দিক থেকে ক্রমাগত সীমানা লঙ্ঘনের বিষয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গণতন্ত্র দিবসের দাবি।

দেশভাগের বলি বাঙালি হিন্দুদের অনেকে আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পরিচয়হীন ও নাগরিকত্বহীন অবস্থায় বসবাস করছেন তা সকলেরই জানা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হিন্দু-শিখরা পুনর্বাসিত হয়েছেন। আজও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলছে নানাভাবে এবং কেউ কেউ বাধ্য হচ্ছেন ভারতে আশ্রয় নিতে— অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতবর্ষ তার সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে সরে আসেনি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অহিন্দুদের উপর বৈষম্য হয়েছে তেমন কোনো নজির নেই। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন সংখ্যালঘু সমাজের মানুষেরাও।

এতক্ষণ আলোচিত হয়েছে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের গঠনতান্ত্রিক বিষয়ে। এবারে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র' এবং শব্দযুগলের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করা যাক। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করা হবে না, যদিও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনে কোনো বাধা থাকবে না। সেক্ষেত্রে secular ভারতবর্ষে একটি common civil code থাকার কথা ছিল। তা কি আছে? তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ নই এবং সেটাকেই কেউ কেউ রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করছেন নানা ভাবে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এও দাবি করে যে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু হিসেবে রাষ্ট্র যেমন কোনো বৈষম্য করবে না, তেমনি বিশেষ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা কোনো রক্ষাকবচও থাকবে না। স্বাধীনতা লাভের ৬৮ বৎসর এবং ভারতবর্ষ একটি গণতন্ত্র রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ার ৬৫ বৎসর পরেও বাস্তব অবস্থা কিসের সাক্ষ্য বহন করছে? এটা খুবই পরিতাপের বিষয়, নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য এমনকী কমিউনিস্ট দলগুলি পর্যন্ত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় একজন মুসলমান প্রার্থী খোঁজেন ভোটে দাঁড় করানোর জন্য। অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলি বলতেই পারে তারা কাকে প্রার্থী করবে সে বিষয়ে অন্যের পরামর্শের দরকার নেই। তবে প্রবণতাটি কারুরই দৃষ্টি এড়ায় না। বিগত ইউপিএ সরকারের রাজত্বকালে স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী এক নির্দেশে বলেন Primafacie প্রমাণ ছাড়া কোনো সংখ্যালঘু মানুষকে আটক করে জেলে রাখা চলবে না এবং রাজ্যগুলিকে Advisory পাঠানো হয় এ বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়ে। জানি না এই নির্দেশ কতটা গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা তা আজও কার্যকর আছে কিনা। এর দ্বারা এমনটা মনে করা যেতেই পারে, অমুসলমানদের উপযুক্ত কারণ ছাড়া গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে দীর্ঘকাল আটক রাখা আইনসম্মত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইমাম ও মুয়াজ্জিন ভাতার মতো সাম্প্রদায়িক তোষণ ব্যবস্থা। রাজনীতির ক্ষেত্রে এর থেকে নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকীকরণ আর কি হতে পারে?

খাগড়াগড় কাণ্ডের মতো ঘটনায় বাংলাদেশের একটি উগ্র জেহাদি সংগঠনের ধ্বংসাত্মক কাজে স্থানীয়ভাবে কাদের সহযোগিতা আছে তাও খতিয়ে দেখার দায়িত্ব সরকারের। **অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দেশের ভিতরে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, আত্মশ্লাঘা এবং আত্মসর্বস্বতা তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং গণতন্ত্র দিবসের মূল আদর্শকে কলঙ্কিত করছে। গণতন্ত্র দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত— 'আমরা সবাই নাগরিক কতিপয় সুবিধাভোগী রাজার দেশে, আমরা যেন সবাই রাজা হতে পারি আর এতে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারেন সচেতন, আত্মমর্যাদাবান আম-আদমিরাই'।**

(লেখক : ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ আধিকারিক)

সমাবেশ সমাচার

জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের সংকল্প দিবস পালন

গত ১৭ জানুয়ারি কলকাতার কেশব ভবনে 'সংকল্প দিবস' পালন করে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক ও শিক্ষিকাসঙ্ঘ। বক্তব্য রাখেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), ড. অজয় কুমার রায় (অধিকর্তা, শিবপুর প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), রন্তিদেব সেনগুপ্ত (সম্পাদক, সাপ্তাহিক বর্তমান), ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ (ডিন, টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট বক্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সহ-সম্পাদক ড. ভাস্কর পুরকায়স্থ। অধ্যাপক চণ্ডীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বাগত ভাষণে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার জন্যই যে সঙ্ঘের উৎপত্তি তা স্মরণ করিয়ে দেন। রন্তিদেব সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতবাসীকে তার সংস্কৃতি ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকের সমাজে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলবার মতো অকপট ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুস্কর। কেন আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠন করতে হলো, নেতাজীর সংগৃহীত আই এন এ তহবিল কোথায় গেল, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু কেন হলো তা আজকের প্রজন্ম জানে না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুর নিশ্চিহ্নকরণের পাশাপাশি ভারতে সংখ্যালঘু জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অনুপাতের তথ্যও তাদের অজানা।

ড. অজয় কুমার রায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, পরিসংখ্যান তত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশের নাম পর্যন্ত শোনেনি এমনও তিনি দেখেছেন। তিনি বলেন, কর্তব্যবোধ জাগরণের জন্য এমন অনুষ্ঠান তিনি বিগত ছয় দশকের শিক্ষক জীবনে এই প্রথম দেখলেন। ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ বলেন, ভারতীয় মহাপুরুষদেরকে ভুলিয়ে দেওয়ার ও শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার একটা দানবীয় প্রয়াস সব সময় কাজ করে চলেছে ভারতীয়দের চিন্তন মননের উপরে। আমাদের লড়াই এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। শিক্ষাঙ্গনে চর্চিত ভারতের যে ইতিহাস তার রচয়িতারা সকলেই ইংরেজ ছিলেন ও তাঁরা ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যরক্ষায় সততঃ তৎপর। বিদেশি বৃত্তি ও পুরস্কারের লোভে ভারতীয়রা আজও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস বলেন, 'হোক চুম্বন'-এর মতো আন্দোলন কখনওই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। সেন্সরবোর্ড থেকে শুরু করে শিক্ষাজগতের সর্বত্র হিন্দুবিরোধীরা ব্যাপ্ত থাকার কারণে এদেশে হিন্দুধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ চলচ্চিত্র মুক্তি পায়, বিকৃত জনবিরোধী ইতিহাস লেখা হয়। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক অজিত বিশ্বাস।

মেদিনীপুরে সেবা বিভাগের রক্তদান শিবির

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি স্থানীয় শরৎপল্লী শিশুমন্দিরে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৬০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। ৪ জন মহিলাও রক্তদান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পঙ্কজ কুমার মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সেবাপ্রমুখ দীপক কুমার সাহু, বিভাগ প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, জেলা কার্যবাহ সমীর কুমার দাস, বিভাগ সঙ্ঘচালক চন্দন কান্তি ভুঁইয়া প্রমুখ।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী পালন

গত ১১ জানুয়ারি রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। গেরুয়া পতাকা-সহ পাঁচটি বাইক এবং ৩০টি সাইকেলে দ্বি-শতাধিক ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এলাকা পরিক্রমা করেন। শেষে প্রখ্যাত সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী বিষয়ে আলোকপাত করেন। পরিশেষে পাঠচক্রের সভাপতি অলোকবরণ চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সমাজ সেবা ভারতীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সরস্বতী পূজা ও সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গত ২৬ জানুয়ারি ধূলাগড়ী পশ্চিমপাড়া (সাঁকরাইল, হাওড়া) 'যুবসমাজ সঙ্ঘ' ক্লাবের সদস্যদের পরিচালনায় ও সমাজ সেবা ভারতীর সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ ৮০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জ্যামিতি বক্স ও কলম বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক সতীনাথ সরকার, প্রধান অতিথি সমাজ সেবা ভারতী হাওড়া জেলা সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত মাইতি, বিশেষ অতিথি প্রতাপ রায়। বক্তারা সেবা ও সংস্কারের কাজে সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শুভেন্দু সরকার।

'পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্'-পাঠ্যপুস্তকের লোকার্পণ

গত ১৮ জানুয়ারি কলকাতায় শ্রী অরবিন্দ ভবনের সভাঘরে কলকাতা সংস্কৃত সম্মেলন সমিতি আয়োজিত বিশাল সংস্কৃত সম্মেলনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে 'পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্'-পাঠ্য পুস্তকের লোকার্পণ করেন মুম্বই উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি হলেন প্রথম শিক্ষার্থী বাংলার ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শেখার জন্য। সহজ, সরল ও উত্তম ষাণ্মাষিক পাঠ্যক্রম 'প্রবেশ'- পুস্তকের মাধ্যমে যে কেউ বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দিতে পারবেন এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রমাণপত্র দেওয়া হবে বলে সংস্কৃত

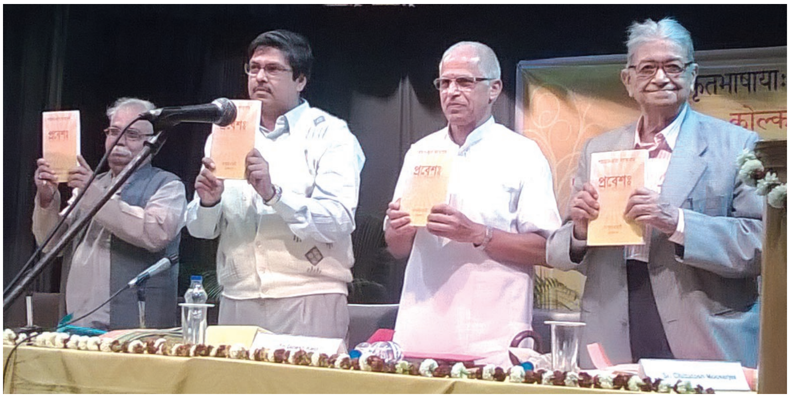

মঞ্চে বাঁ দিক থেকে প্রদীপ মজুমদার, বিনায়ক সমাদ্দার, দীনেশ কামত ও চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়।

ভারতীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতের পূর্ব সেনাপ্রধান জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কামত এবং গণিতাচার্য ড. প্রদীপ মজুমদার। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ড. বিনায়ক সমাদ্দার চৌধুরী। প্রাচীন বিমানবিদ্যা বিষয়ে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরেন 'বাক' নামক সংস্থার কর্মকর্তাগণ। সংস্কৃত ভাষাকে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যসূচিতে আবশ্যিক করার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব পাঠ করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের বেদ বিদ্যালয়ের প্রধান স্বামী বেদতত্ত্বানন্দ মহারাজ। কলকাতার অনেক বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অনেকেই 'পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্'-পাঠ্যক্রমের শিক্ষার্থী হিসাবে পঞ্জীকরণ করেন। সকলকে ধন্যবাদ জানান শ্রী অরবিন্দ ভবনের সম্পাদক বিশ্বজিত গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বর বিবেকানন্দ সেবা ভারতীর স্বামীজী জয়ন্তী

বিবেকানন্দ সেবা ভারতীর (দক্ষিণেশ্বর) উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বর রেল কলোনি সংলগ্ন দেশপ্রিয় ইনস্টিটিউটে পালিত হলো স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৩ তম জন্মবর্ষ। গত ১১ এবং ১২ জানুয়ারি ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদবিদ্যা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক নরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কর্মরত প্রাক্তন এডিএম শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় মানুষের হার্ট-সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ড. দেবী শেঠির নির্দেশিত বারাসাত নারায়ণী হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক এই পরীক্ষা করেন। এদিন এলাকার দুঃস্থ সাধারণ মানুষকে কম্বল ও চাদর প্রদান করা হয়। বিকেলে রবীন্দ্রভারতীর সাংস্কৃতিক সংস্থা দ্বারা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হয়।

১২ তারিখ স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা 'বলিষ্ঠ ভারত গঠনে বিবেক ভাবনা' বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে সমাজ তথা জীবন গঠনের ব্যাপারে আলোকপাত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রপ্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেবা ভারতীর সভাপতি অধ্যাপক চণ্ডীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক তরুণকান্তি ঘোষ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সিউড়িতে শ্রদ্ধার পঞ্চম বাৎসরিক সম্মেলন

গত ১৮ জানুয়ারি বীরভূম জেলার সিউড়ি সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধার অনুদানী সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার। পরে যে সকল বয়স্ক ব্যক্তি (সহস্র চন্দ্র দর্শনকারী) যাদের শ্রদ্ধা দিতে পেরে শ্রদ্ধা সংস্থা ধন্য হয়েছে, এমন ১২ জন ব্যক্তি সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তাঁদের অমর আত্মার প্রতি ১ মিনিট সকলে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। এরপর অনুদানী মহাশয়গণ তাঁদের অনুভবী সংক্ষিপ্ত মতামত দেন। তাঁরা হলেন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন কুণ্ডু, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা নিবেদিতা চক্রবর্তী, অরিজিৎ হাজরা, চন্দ্রভাগা পত্রিকার সম্পাদক ও বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ প্রমুখ। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা ও শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক সুব্রত সিনহা।

শোকসংবাদ

গত ৭ জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস খণ্ডের বামনিয়া গ্রামের স্বয়ংসেবক সুশান্ত মিত্রের মাতৃদেবী বিমলা মিত্র পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ১ পুত্র রেখে গেছেন।

***

বাঁকুড়া জেলার রাইপুর খণ্ডের স্বয়ংসেবক বিধান আকুলির পিতৃদেব শক্তিপদ আকুলি গত ২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ফেডেরার কি সর্বকালের সেরা টেনিস তারকা ?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্ট্রেলিয়া ওপেন শুরুর আগে প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট ব্রিসবেন এটিপি জিতে রজার ফেডেরার ঢুকে পড়লেন মহার্ঘ সেই এলিট ক্লাবে। পেশাদার টেনিস কেরিয়ারে হাজার ম্যাচ জিতে মণিকাঞ্চন শোভিত টেনিস জীবনকে এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গেলেন ফেডএক্স। যে ক্লাবে এর আগে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছেন কেবলমাত্র দু'জন খেলোয়াড়। জিমি কোনস ও ইভান লেন্ডল। লেন্ডল আবার কয়েকমাসের জন্য ফেডেরারকে কোচিংও করিয়েছেন। গুরু-শিষ্য দু'জনেই প্রখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান কোচ টনি রোমের হাতে গড়ে উঠেছেন। মেলবোর্নের বাড়িতে বসে খেলোয়াড় ও কোচ দু-ভাবেই নিজের গুরুত্ব ও মর্যাদা ধরে রাখা টনি রোশ নিশ্চয়ই তার দুই কিংবদন্তী ছাত্রের এহেন কৃতিত্ব দেখে বিশেষ শ্লাঘা অনুভব করছেন। এবছরটা অবশ্য ফেডেরারের কাছে একটু বেশিই গুরুত্বপূর্ণ। দু-বছর আগে শেষ গ্রান্ডস্লাম জিতেছেন। ১৭টা গ্রান্ডস্লামের মালিক ফেডেরারের টার্গেট এবছর অন্তত একটা স্লাম জিতে তাঁর মুকুটের পালকের বর্ণময় শোভাকে আরো একটু বাড়িয়ে নেওয়া। ফেডেরার নিজে যতই বলুন না কেন বয়স হচ্ছে একটা নাম্বার। কিন্তু নিজে ভালভাবে জানেন ৩৪ বছর বয়সে ধারাবাহিক ভাল খেলা ও টুর্নামেন্ট জেতা সম্ভব নয়। এখন বিশ্বজুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বেড়ে গেছে।

প্রতিদিনই নতুন নতুন তারকার জন্ম হচ্ছে। এসব সামলে পরপর টুর্নামেন্ট জেতা অলীক বাস্তব। অন্তত একটা গ্রান্ডস্লাম জেতা তাই অবসরের আগে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। যা হবে মধুরেণ সমাপয়েত। ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে 'সুইস আইসবার্গ' রজার ফেডেরার কি সর্বকালের সেরা খেলোয়াড। এদেশের জয়দীপ মুখোপাধ্যায় থেকে আমেরিকার নিক বলতেয়ারির মতো আন্তর্জাতিক বোদ্ধাদের অভিমত এখনো পর্যন্ত যা কীর্তি করে দেখিয়েছেন ফেডেরার, তাতে তাঁকে সর্বকালের সেরা না বলে উপায় নেই। টানা এক দশকের বেশি সময় ধরে সব রকমের সারফেস ও পরিবেশে দিনের পর দিন চরম উৎকর্ষের টেনিস খেলে যাওয়া কোনো রকম সহজ ব্যাপার নয়। একমাত্র রাফায়েল নাদাল ছাড়া কেউ তাঁকে টপ ফর্মে সেভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি। যে ফরাসী ওপেন এক সময় তাঁর কাছে চিরকালীন গাঁট বলে প্রতিপন্ন হোত, সেই রোলাগ্যারোর বধ্যভূমিতে স্বয়ং নাদালকে হারিয়ে খেতাব মাথার ওপর তুলে ধরেছেন। যে কয়েকবার ফাইনালেও উঠেছেন এই কোর্টে যা প্রমাণ করে ক্লে কোর্টেও তাঁর অনায়াসলব্ধ দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রয়োগধর্মী মুন্সিয়ানার ব্যাপারটি।

বিশ্বের ৩০টি বড় শহরে তার জয়পতাকা উড়িয়ে বেড়িয়েছেন। গ্রাস, হার্ড, ক্লে, সিনথেটিক কোনো কোর্টেই না তাঁর টেনিস র‍্যাকেট ঝলসে উঠেছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে টনি রোশ এসেছিলেন সল্টলেকের জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের অ্যাকাদেমিতে। সেখানে কথা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেছিলেন একমাত্র সমকালীন স্বদেশীয় কিংবদন্তী রড লেভার ছাড়া কাউকে সব ধরনের সারফেসে ফেডেরারের মতো এতটা দাপট নিয়ে খেলতে দেখেননি। রড লেভার এ বছরে ওপেন যুগের আগে চারটি গ্রান্ডস্লাম জিতেছেন আবার ওপেন যুগেও এই কীর্তি করে দেখিয়েছেন। রোশের মতে লেভার এক অন্য গ্রহের খেলোয়াড়। তার হাত ধরেই উত্তর আধুনিক টেনিস সভ্যতার সংকৃত্যায়ন হয়েছে। আর লেভারের যোগ্য উত্তরসূরী হাল আমলের রজার ফেডেরার। তবে হাজার ক্লাবের প্রথম জিমি কোনর্স কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিভা ও টাচের বিচারে এই দুজনের চেয়ে খানিকটা হলেও উন্নততর। কোনর্স ও সামান্য পরবর্তী সময়ের জন ম্যাকেনরো অসামান্য প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মেজাজকে সবসময় নিয়ন্ত্রণে না রাখা, দুর্বিনীত আচরণ মাঝেমধ্যেই তাদের টপ ফর্মের খেলায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। না হলে দুজনের রেকর্ডকে আরো উজ্জ্বল দেখাতো। তবে প্রতিভার মাপকাঠিতে এই দুই মার্কিনী 'গ্রেটমাস্টার' টেনিসে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছেন। রয় এমার্সনের রেকর্ড ভেঙে ফেডেরার সর্বাধিক গ্রান্ডস্লাম জয়ের রেকর্ড গড়ার দিনই অন্য ইতিহাস রচনা হয়ে গেছে। যারা কেরিয়ারে সদাসর্বদা ইতিবাচক ও রোম্যান্টিকতা ধরে রেখে নিত্যনতুন মুখ জয়ের অভিলিপ্সা যে একজন খেলোয়াড়কে কোথায় তুলে দিতে পারে তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত রজার ফেডেরার। রড লেভার, বিয়র্নবর্ন পিট সাম্প্রাস, রজার ফেডেরার চার যুগের চার টেনিস শিক্ষক। তবে সব মিলিয়ে তুল্যমূল্য মূল্যায়নে লেভারই বোধহয় সর্বকালের সেরা হয়ে থাকবেন। তবে ঠিক পিছনেই থাকবেন রজার ফেডেরার। একমাত্র অলিম্পিক সিঙ্গেলস সোনা ছাড়া সব খেতাব যার করায়ত্ত, তিনিই যে লেভারের যথার্থ উত্তরসূরী তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই।

শব্দরূপ-৭৩৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

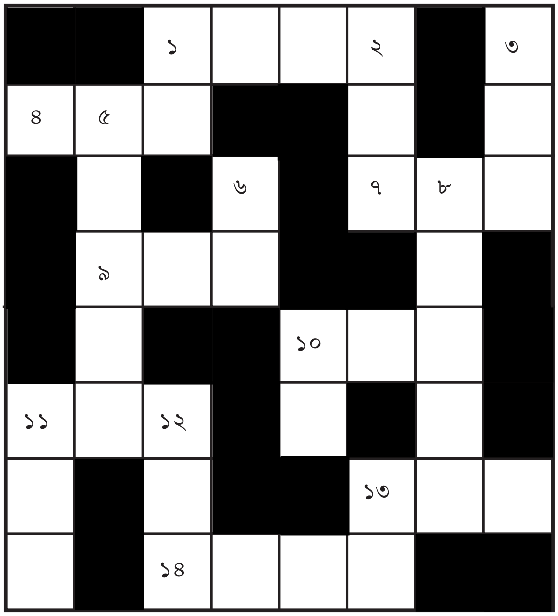

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** গালার তৈয়ারী বাড়ি (মহাভারতে উক্ত), **৪.** গায়ক ভিক্ষু সম্প্রদায় বিশেষ, **৭.** অগ্নি, **৯.** যযাতির পিতা, **১০.** জগৎপালক; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি, **১১.** কশ্যপপত্নী; অরুণ ও গরুড়ের জননী, **১৩.** পঙ্গপাল; পতঙ্গ বিশেষ, **১৪.** জ্যোতিষে, অশুভ সময় বিশেষ।

উপর-নীচ : **১.** এর অপর নাম জীবন, **২.** নদীতে হঠাৎ বানের আবির্ভাব, **৩.** শিব, **৫.** যজ্ঞসূত্র ধারণস্বরূপ সংস্কার; পইতা দেওয়া, **৬.** রাশিচক্রের প্রথম রাশি, **৮.** পুরোপুরি পাগল, **১০.** বিবেকানন্দের ডাকনাম, **১১.** নক্ষত্র বিশেষ; শ্রীরাধার সখী, **১২.** রাক্ষসী বিশেষ, মারীচের জননী, রামকর্তৃক নিহত, **১৩.** পরামর্শ, মন্ত্রণা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

কৌ	স্তু	ভ		বি	ভা	ব	রী
ল		বা	স	র			
	ন	নী		তি	ন	কা	ল
	ক্ত					দ	
	ন্দি					স্ব	
ভ	ব	ভূ	তি		প	রী	
			ল	লা	ট		খ
ত্রি	পি	ট	ক		ল	হ	না

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৩৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ২ মার্চ ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ১৩

SURYA
EVERY CITY EVERY HOME
LED
CFL
FAN
PIPES
The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions,
unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from
EVERY CITY EVERY HOME
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
9 February - 2015

দাম : ১০.০০ টাকা